কালের ধারায় সমাজ অর্থনীতি সংস্কার কল্যাণ ইত্যাদি

অনুপম গুপ্ত

আসুন কোথাও বসে একটু গল্প করি। কোথায় বসবেন? পার্কগুলোতে ঢোকার পথও তো নোংরা। একটু পিছিয়ে চলুন। সময়ের পথ ধরে পঞ্চাশ-ষাট কি সত্তর বছর। উত্তর কলকাতার পথের ধারে তো বাড়ির রকের অভাব নেই। রামবাবু-কেষ্টবাবুদের বাড়ির রক, গড়পার বারোয়ারিতলায় বুজি দত্তর বাড়ির রক, আর একটু এগিয়ে গেলে প্রিয়নাথ মল্লিক স্ট্রীটের কাছে মিলনবাবুর বাড়ির রক। একটু দূরে নিরাপদর চায়ের দোকানের তোলা উনুন ফুটপাথে রেখে ধোঁয়া দেওয়া হয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশনের লোক এসে লম্বা লম্বা লাঠিওয়ালা ব্রাশ দিয়ে ঝাড়ু দিয়ে এক একটা জায়গায় জড়ো করে রাখছে। একটু পরেই কর্পোরেশনের ওড়িয়া লোকেরা লম্বা পাইপ নিয়ে এসে রাস্তার চাপা-কল থেকে জল ছড়াবে। সে যুগে একজন পাইপের মোটা মুখটা চাপাকলে লাগিয়ে আর একটা ইংরেজি টি-এর মত দেখতে হাতল ঘুরিয়ে জল ছেড়ে দিত। অন্যজন পাইপের পিতলের সরু লম্বা অন্য মুখ দিয়ে রাস্তায় জল ছিটিয়ে দিত। সরু মুখের উপরে আঙুলের নানা রকম কায়দায় চাপ দিয়ে কখনো উঁচু করে অনেক দূরে রামধনুর মত গোল হয়ে এসে জল পড়ছে। কখনো আঙুলের জোরালো চাপে ফুটপাথের নিচে রাস্তার কোণা ধরে তোড়ে জলের ধাক্কায় ময়লা ঠেলে দিত।

গঙ্গা থেকে তখন রাস্তার নিচের পাইপ দিয়ে সারা শহরে জল আসতো। রাস্তার চাপাকলের লোহার ঢাকনা খুললে গঙ্গাজলের পাইপের কলের মুখ পাওয়া যেত। কোনো পসারি তখন রাস্তায় বসতো না। কাজেই পসারির ফেলে যাওয়া আবর্জনা সরানোর কথা তখন উঠত না। পসারিরা সবাই বসত কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রিত নির্দিষ্ট বাজারে। গরীব মানুষদের মধ্যে জুতো পরবার চল ছিল না। সঙ্গতিপন্ন বাড়ির ছেলেরাও তখন খালি পায়ে রাস্তায় ক্যাম্বিস (ক্যানভাস) বল নিয়ে ফুটবল খেলত, ক্রিকেট খেলত। এপাড়া থেকে ওপাড়ায় ক্যাম্বিস বল প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে খালি পায়ে চলে যেত। অনেক সাবেকী চালের অবস্থাপন্ন ঘরের মহিলারাও জুতো পরতেন না। রবি, নিতুদের বড় তিনতলা বাড়ি থেকে মা-কাকিমারা সাদা খোলের লাল কালো লতাপাতা করা চওড়া পাড়ের শাড়ি পরে,

পায়ে মোটা করে আলতা দিয়ে, খালি পায়ে বাড়ির কোনো কর্তার পিছনে পিছনে বেরিয়ে পড়তেন। কর্তার পরনে থাকত পুরো হাতার শার্ট, মালকোচা দেওয়া ধুতি, আর তখনকার দিনের শৌখিন জুতো, যাকে বলত গ্রীসিয়ান শ্লিপার। সঙ্গতিপন্ন বাড়ির মেয়েরা তখন শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বাইরের মানুষের সামনে বেরোনোর কথা ভাবতে পারতেন না। পুরুষদের অবশ্য শুধু গামছা পরেও বাইরে বেরোনোতে কোনো বাধা ছিল না। সতু চক্রবর্তীর বাড়ি তো ছিল খেলোয়াড়দের বাড়ি। কাকা ছিলেন কলকাতার মাঠে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটের আম্পায়ার। যে দিন খেলা থাকতো সাদা দামি কাপড়ের ফুলপ্যান্ট, কালো-মোহনবাগান ক্লাবের ব্যাজ লাগানো ব্লেজার কোট, ভালো সাদা জুতো পরে মাঠে যেতেন। তখনো 'ট্রাউজার্স' শব্দটা বাঙালির আটপৌরে ভাষাতে চালু হয়নি। ট্রাউজার্সকে তখন বাঙালি ঘরে ফুলপ্যান্টই বলত। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকেই অন্য কোনো সময়ে হয়তো খালি গায়ে গামছা পরে বড় রাস্তা পার হয়ে বাজারে যেতে দেখা যেত।

রাস্তায় স্কুল থেকে ফিরে, ছেলেরা ক্যম্বিস বল খেলতে গেলে রাস্তার আবর্জনার স্তূপের ভাবনায় কারুকে মাথায় হাত দিয়ে বসতে হত না । ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় যখন মানুষ পাড়া ছেড়ে বেরোতে ভয় পেত তখন প্রথম পাড়ার মধ্যে রাস্তার ধারে আনাজপাতি নিয়ে পসারিরা বসতে শুরু করল। তারপরে দেশভাগ হবার পরে উদ্বাস্তুরা এসে বাজারের বাইরে বড় রাস্তার ধারে কোনো রকমে বেঁচে থাকার তাগিদে পসরা নিয়ে বসতে শুরু করল। তখন কর্পোরেশনের কলের জল লোকে নিশ্চিন্তে পান করত। পয়সা দিয়ে তখন সোডা-লেমনেডের বোতল দোকান থেকে কিনতো কিন্তু পয়সা দিয়ে জলের বোতল কেনার কথা কেউ ভাবতে পারত না। জল যে দামী এটা বোধ হয় আমার ঠাকুরদাদা প্রথম বলেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে হজমের গোলমালে বিব্রত হয়ে উনি ফোটানো জল খাওয়া শুরু করলেন। ঠাকুর্দা তাঁর পুত্রবধূকে ঐ দামী জল অন্য কারুকে দিতে নিষেধ করতেন। আমার দিদিমা, ঠাকুর্দার মুখে "দামী জল" কথাটা শুনে কৌতুক করেছিলেন। যে রকম কৌতুক বেয়াই-বেয়ানদের মধ্যে হামেশাই হয়ে থাকে।

পাড়ার মধ্যে মেলামেশায় ভদ্রলোকেরা নিজেদের পেশা বা ডিগ্রি বা পদমর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। মিলনবাবু হয়ত কোনো সদাগরী আপিসের বাবু ছিলেন। তাঁর বাড়ির রকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসবিহারী অধ্যাপক পি সি মিত্র এসে বসতেন। দোলের দিন সত্য দাস-গোপেশ দাসের রকে অনেকেই এসে বসতেন। পাড়ার রকগুলি বয়সের তারতম্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছিল। রামবাবু আর কেষ্টবাবু ছিলেন দুই ভাই। বৃদ্ধদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল ওঁদের বাড়ির রক। পাড়ার বারোয়ারীতলার পূজোয় ও বাড়ির ছেলেরা তদারকি করত। তিন মহলা বাড়ি। পাশের গলি দিয়ে গেলে অনেকখানি ওঁদের বাড়ির দেয়াল চলবে। মেরামতের অভাবে পেছনের দুটো মহল প্রায় ইটের স্তূপের মত। পাড়ায় কোনো গোলমাল হলে, কোনো বাড়িতে অন্যায় হতে দেখলে রামবাবু-কেষ্টবাবু প্রতিবিধানের জন্য এগিয়ে যেতেন। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। প্যাঙা-বেজোরা চার ভাইও ছিল ব্রাহ্মণ। মায়ের নামে বড় বাড়ির অংশে থাকে— হত দরিদ্র। ছোট ভাইটা নির্বোধ। তার উপরে বিধবা ছোট বোন রুণু

সন্তান নিয়ে এসে উঠেছে। কোনো এক দিন ভোরবেলা ভাইরা রুণুকে নিগ্রহ করছে। রুণুর কান্না শুনে রামবাবু-কেষ্টবাবু চুলের মুঠি ধরে প্যাঙা আর বেজোকে রাস্তায় টেনে এনে কয়েক ঘা দিয়ে দিলেন। পাড়াকে অনেকটা পরিবারের মত ভাববার অভ্যাস তখন ছিল। তারপর একদিন হঠাৎ কি হল কে জানে। রামবাবু-কেষ্টবাবু আগের থেকে কারুকে কিছু না বলে অতখানি জমিজোড়া অত বড় বাড়ি বিক্রি করে চলে গেলেন। রামবাবু গেলেন গোয়াবাগানে ভাড়া বাড়িতে আর কেষ্টবাবু অনেক দূরে— দমদম না মধ্যমগ্রামে। যিনি বাড়ি কিনলেন তিনি স্বর্ণকার। এসে প্রথমেই রকের উপরে পাঁচিল তুলে দিলেন। রামবাবু-কেষ্টবাবুর রক উঠে গেল। ওদিকে বিশাল তেলকলের মাঠে এক দিকে টেলিফোন অফিস অন্য দিকে সিআইটি-র বিশাল আবাসনের ফ্ল্যাট বাড়ির সূচনা হল। কলকাতার পাড়াগুলির সমাজে পারিবারিক বোধের থেকেও পেশাগত, জীবিকাগত সচেতনতাসম্পন্ন ব্যক্তিমানুষের গুরুত্ব বাড়তে লাগল।

রাজনীতি তখনো মানুষের চৈতন্যকে গ্রাস করেনি। গড়পার বারোয়ারীতলার দুর্গাপুজোর বিসর্জনে বাঁশের মাচার উপরে বিশাল একচালা ঠাকুর ঘাড়ে নিয়ে জোয়ান ছেলেরা সারা অঞ্চল ঘুরে আসতো। তখন ছেলেদের সবার কপালে বড় করে সিঁদুর লেপা থাকত। অনেকের হাতে থাকত পাকা বাঁশের লাঠি। সব মিলে একটা লড়াই লড়াই মেজাজ। লড়াই করবার জন্য যুগীপাড়ার ছেলেরা বিসর্জনের দিন মুখিয়েই থাকত। কিন্তু লড়াইতে কিল-ঘুষির বেশি কিছু কখনো চলেছে বলে শুনিনি। কারো মাথায় হাতের লাঠি পড়ার খবর কখনো কেউ দেয়নি। রক্তপাত বলতে একবারই— সেও ঐ বিসর্জনের শোভাযাত্রা, কে আগে যাবে সেই রেষারেষি নিয়েই। রুণু বক্সারের ঘুষিতে নাকি গোয়ালাবাড়ির কেতো অর্থাৎ কার্তিকের কপাল ফেটে গিয়েছিল। তখনকার মারামারিতে আজকের মত কে কোন রাজনৈতিক দলের সমর্থক সে কথা কারুর মাথায় আসতো না। অমিয়কুটিরের পাশের গলির মুখে হোমিওপ্যাথ চক্রবর্তীবাবুর মা মরা মেয়েটা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে থাকত। তখনকার দিনে এগারো বারো বছরেই মেয়েরা শাড়ি ধরত। মেয়েটার পরনে আধময়লা শাড়ি, ফরসা মুখ ঘামে ভেজা। বোধ হয় বাড়ির রান্নাবান্না পাঁচ কাজ ওকেই সামলাতে হত। ভাই টুনু বক্সারের পাড়াতে মারকুটে বলে দুর্নাম ছিল। হঠাৎ এক দিন পাড়াতে হৈ চৈ। বারোয়ারিতলার ওপাশের বাড়ির লঙ্কাদার ভাই মেয়েটাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে এনে বাড়িতে তুলেছে। লঙ্কাদার ভাইকে পেলে টুনু বক্সার দেখে নেবে। কায়েত হয়ে বামুনের মেয়েকে বিয়ে করার দুঃসাহস কি করে হল? লঙ্কাদা তো কমিউনিস্ট ছিলেন। কর্পোরেশনের নির্বাচনে বামপন্থীদের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সেইবার ওপাড়ার কর্পোরেশনের নির্বাচনে জিতেছিলেন নন্দদুলাল শ্রীমানী। কিন্তু পারিবারিক ক্রিয়াকর্মে রাজনীতির কিছু করবার ছিল না।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ গেছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। জহরলাল প্রধানমন্ত্রী, প্রথমে রাজাগোপালাচারি পশ্চিম বাংলার গভর্ণর হয়ে এলেন। তারপরে ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের গভর্নর জেনারেল হয়ে রাজাগোপালাচারি দিল্লি চলে গেলে কৈলাসনাথ

কাটজু পশ্চিম বাংলার গভর্নর হয়ে এলেন। প্রফুল্ল ঘোষ পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা অনেক দিন ধরেই চলেছে। যুদ্ধের আগে প্রথম পরিকল্পনার খসড়া করলেন মহীশূর করদ রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ার বিশ্বেশ্বরাইয়া। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে তখন থেকেই রবীন্দ্রনাথ, জহরলাল, সুভাষচন্দ্রের মত বিনিময় চলেছে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট রাজত্বে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পিত অর্থনীতির সাফল্য অনেককেই মুগ্ধ করেছে, প্রভাবিত করেছে।

কলকাতার রাস্তায় সন্ধ্যাবেলা গ্যাসের আলো জ্বলত। কর্পোরেশনের লোক মই ঘাড়ে করে ছুটে ছুটে থামে উঠে আলোগুলি জ্বেলে দিত। ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন ছিল শহরের রাস্তায়। হাতে-টানা রিক্সায় চেপে লোকে গঙ্গাস্নান করতে যেত। কপালে ঠাকুরের নাম লেখা গঙ্গামাটির তিলক দিয়ে রিক্সায় চেপে ফিরত। বর্ষাকালে কলকাতার গঙ্গার নানা ঘাটে জেলেরা ইলিশ মাছ ধরে এনে বিক্রি করত। ছোটকাকা ফোর্ট উইলিয়াম থেকে আপিস করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরবার সময় ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে ফিরছেন। ভোরবেলা কর্পোরেশনের লোক এসে লম্বা আঁকশি দিয়ে গ্যাসের আলো নিভিয়ে দিয়ে যেত। গ্যাস আসত ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির নারকেলডাঙ্গা ব্রীজের কাছে বিশাল প্রতিষ্ঠান থেকে। বিদেশি প্রতিষ্ঠান, যেমন বিদেশি প্রতিষ্ঠান ছিল ট্রাম কোম্পানি, ইলেক্ট্রিক কোম্পানি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেই দেশের নানা অঞ্চলের রেল পরিচালনা ব্যবস্থা ঔপনিবেশিক ইংরাজ সরকার অধিগ্রহণ করলেও সাধারণ মানুষের মুখে রেল কোম্পানি কথাটাই চালু ছিল। সরকারি ব্যবস্থা হলেও মালিকানাতে তখন প্রধানত বিদেশি ও কিছু দেশি ব্যক্তিগত অংশীদারী ছিল। রেল কর্মচারিরা চাকরির শর্তে পুরোপুরি সরকারি কর্মচারি ছিল না।

অবিভক্ত ভারতে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে কলকাতার স্থান বম্বের (মুম্বই) সমতুল্য ছিল। দেশের মধ্যে কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চলের বিশেষ রকমের গুরুত্ব ছিল। কলকাতা থেকে আসানসোল হয়ে ধানবাদ পর্যন্ত রেলপথ ঘিরে যে শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছিল তার সাফল্য আর সার্থকতা ছিল প্রশ্নাতীত। তাই স্বাধীনতার ঠিক পরেই রেলের ইঞ্জিন তৈরির কারখানা হল বর্ধমান জেলার মিহিজামে। নাম হল চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ। তারপরে শিল্পনগরী দুর্গাপুরের সৃষ্টি। তারপরে ষাট বছর কেটে গেছে। এখনকার খবরের কাগজে দেখলাম এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের বার্ষিক সভা এই বছর হল দিল্লির উপকণ্ঠে নয়ডায়। সেখানে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক দিল্লি থেকে বম্বে পর্যন্ত একটা শিল্পপ্রসারী ক্ষেত্র—করিডর তৈরির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছে। এজন্য অর্থ সাহায্য এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক করবে। কলকাতা থেকে ধানবাদ এখন আর দেশের মধ্যে অগ্রাধিকার পাবার মত ক্ষেত্র নয়। দুর্গাপুর অনেকদিন ধরেই সমস্যাদীর্ণ। আসানসোল-কুলটি-ওয়ারিয়ার কোনো রকমে অস্তিত্ব বজায় আছে ।

মনে পড়ছে তানুকাকার কথা, ভেলুকাকার কথা। দেশ স্বাধীন হবার পরে শিল্পায়নের দ্রুত বিকাশ হতে লাগল। যাদবপুর টেকনিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করা, টাটা বা রেল বা অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে প্রশিক্ষণ পাওয়া বাঙালি ছেলেরা দুর্গাপুরে, আসানসোলে ভাল

চাকরি পেতে লাগল, চাকরিতে উন্নতি করতে লাগল, চাকরিসূত্রে ইউরোপে যেতে লাগল। পরীক্ষার ফল ভাল হলে ছেলেদের লেখাপড়ার সোজা পথে না পাঠিয়ে অভিভাবকরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পাঠাতে লাগলেন। দেশের অর্থনীতিতে তখন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চালু হয়েছে। বৃত্তি বা জীবিকার মার্কায় মানুষের পরিচয় আরো পাকা হতে শুরু করল। আর পরিবার, সমাজ-নির্দিষ্ট পরিচয় ক্রমশ গৌণ হয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বটা সম্মানের জায়গাতে, বৈশিষ্ট্যের জায়গাতে এসে চেপে বসল। আগে আইন ব্যবসা আর চিকিৎসা ব্যাবসায় প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিপত্তির কথাটা জড়ানো ছিল। অধ্যাপনা তখন অর্থকরী না হলেও বৃত্তি হিসাবে সমাজের চোখে সামনের সারিতে চিহ্নিত হত। এছাড়া অবস্থাপন্ন বাঙালি মধ্যবিত্তের জীবিকা ছিল ছোট ছোট ব্যবসা।

সত্যদাস-গোপেশদাসদের 'সাইন্টিফিক গ্লাস এপারেটার্সের' কারখানা ছিল বাড়ির নিচেই। ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানির গ্যাসের তীক্ষ্ণ শিখা দিয়ে নানা আকারের নল, পাত্র তৈরি হতে দেখা যেত। একতলায় কারখানা আর দোতলায় পরিবারের ঘর-গৃহস্থালী। বাইরের রকে উৎসব অনুষ্ঠানে পাড়ার সম্মানিত বড়রা এসে বসতেন। সেই সব বড়দের সম্মান তখন বৃত্তি বা বিত্তর মাপে নির্ধারিত হতে শুরু হয়নি। গলির মধ্যে কালী গুপ্ত-হরেন গুপ্তর বাড়ির একতলায় হাইড্রলিক যন্ত্রে কার্ড বোর্ড কাটার শব্দ শোনা যেত। নানা আকারের কাগজের বোর্ডের বাক্স তৈরির কারখানা। আর একটু এগোলে ছড়ানো জমি— বাইরের বাড়ি-ভিতরের বাড়ি নিয়ে নিত্য সেনের কালী তৈরির কারখানা। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের উপরে বড় বড় দুটো বাড়ির মাঝখানে টিনের শেডের উপরে বিশাল চিমনি লাগানো কারখানাতে গুড় থেকে অ্যালকোহল তৈরি হচ্ছে। কারখানার মালিক কার্তিক বোসের লেবরেটরি ছিল আমহার্স্ট স্ট্রীটে। কার্তিক বোসের ছিল একটা কালো শৌখীন ঘোড়ার গাড়ি। একটা ধপধপে সাদা ঘোড়া গাড়িটা টানতো। তখন সাদা ঘোড়া রাখার শৌখিনতা বোধ হয় শেষ হয়ে যায়নি। সুকিয়া স্ট্রীটের বড় ব্যবসায়ী, নন্দদুলাল শ্রীমানীর বাবা মহেন্দ্র শ্রীমানীর একটা সাদা ঘোড়া ছিল। তখন ভাড়া খাটত থার্ড ক্লাস ছ্যাকরা গাড়ি। প্রতি বছর রাস পূর্ণিমাতে ধর কোম্পানি আকাশে নানা রকম হাউই বাজী ছাড়ত। তার নানা রঙের তারার আলোতে ভাড়াটে বাড়ির দোতলার ছেলে আর তিনতলার মেয়ের চুপি চুপি এসে ছাদে দাঁড়ানো সতেরো বছরের কিশোর আকাশ আলোকিত হয়ে যেত। ধর কোম্পানির ছিল একটা কালো রঙের ফোর্ড গাড়ি। ছোট ব্যবসায়ীরা তখনকার দিনের বিচারে অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত হলেও মোটর গাড়ি বিশেষ কারুর থাকত না। এদের মধ্যে অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আদর্শে প্রেরণা নিয়েছিলেন। ব্যবসা চালাতে হলে কোনো রাজনৈতিক দলের আশ্রয় একান্ত আবশ্যক বলে কেউ তখন স্বপ্নেও ভাবত না। রাজনৈতিক প্রসাদে পুষ্ট গুণ্ডা তখনো যেখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়েনি। উত্তর কলকাতার বিভিন্ন পাড়ায় তখন অনেক ছড়ানো বস্তি ছিল। তখনো বস্তির খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে কেউ সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙ্গে কিছু পাওয়া যাবে বলে ভাবতে শুরু করেনি। এখানে আইনের শাসনের কথা কারুর কারুর মনে আসতে পারে। কিন্তু সমাজকে অস্বীকার করলে আইনের শাসনেরও

কোনো ঠাঁই থাকে না।

দেশভাগের যন্ত্রণা সাবেক মধ্যবিত্ত পাড়ায় কোনো ছাপ ফেলেনি। পাকিস্তান থেকে তাড়া খেয়ে প্রাণ নিয়ে যারা এসে খালের ওপারে বস্তিতে বসেছিল তার কেউ গাজনের সং সেজে, হিন্দি সিনেমার নায়িকা সেজে গান গেয়ে নেচে মধ্যবিত্ত পাড়াতে ভিক্ষা করতে আসতো। মুকুন্দ দাসের দলের কোনো একজন সারেঙ্গী বাজিয়ে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে গান করত। পূর্ব বাংলার পঞ্চাশের হিন্দু বিতাড়নের আগে কলকাতার মানুষ খুব একটা মুকুন্দ দাসের নাম জানত না। মধ্যবিত্ত পাড়ার সমাজ এক ছন্দে চলেছে। বৃত্তি সচেতন মানুষ ক্রমশ স্বতন্ত্র ব্যক্তি হবার দিকে এগোতে থাকলেও সমাজকে না মেনে চলার কথা বড় হয়ে উঠতে শুরু করেনি। পাড়ার ছেলেরা চাকরি করতে শুরু করেও পাড়ার রকে বসে সিগারেট টানার চেষ্টা করত না। অল্পবয়সীরা পাড়ার সীমানা পেরিয়ে গিয়ে সিগারেট ধরাতো। উদ্বাস্তু কথাটা চালু হল। 'উদ্বাস্তু' নামে কর্পূর দেওয়া চিঁড়ের গজা দোকানে আসতে শুরু হল। এগুলি নানা রকম ছোট ছোট অল্প পয়সার মজা। এই রকম মজা ছিল বড় নেতাদের অনুষ্ঠানে আসা। জীতেন্দ্রনারায়ণ রায় ইন্‌ফ্যান্ট নার্শারী স্কুলের উদ্বোধন করতে এলেন জহরলাল নেহেরু। একটা লম্বা হুড-খোলা গাড়িতে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। রাস্তার দু-দিকে লোকেরা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে দেখছে— হাততালি দিচ্ছে। পুলিশ সেখানে নামমাত্র। শালখুঁটি আর বাঁশের বেড়া দিয়ে লোক ঠেকানোর ব্যাপার নেই। আচমকা কোনো আততায়ী এসে আক্রমণ করার ভয় নেই। নিরাপত্তার ফাঁসে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার কোনো অবস্থা হয়নি। তার অনেক বছর পরে চেয়ারম্যান মাও-এর 'লাল বই'-এর সময় থেকে বাংলার তরুণদের চোখে স্বপ্নের ঘোর ধরাতে শুরু করেছে। দেশে একনায়কতন্ত্র তখন নিরাপত্তার সত্যমিথ্যায় মানুষের সমাজ বিপর্যস্ত করেছে। দেশের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা তখন কলেজের ছাত্র-মাস্টারদের অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। তখন শান্তিনিকেতনের সমাবর্তনে নিরাপত্তার নামে একটা মাত্র বাঁশের সরু গলিপথ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে দেখার হুজুগে জনতার সঙ্গে অধ্যাপকদেরও ঢোকার পথ নির্দিষ্ট হল। অনেক অধ্যাপক সেই বছর থেকে শান্তিনিকেতনের সমাবর্তনে যাওয়া বন্ধ করলেন।

ভারত-চীন যুদ্ধে দেশের সামরিক বিপর্যয়ের পরে নিরাপত্তার প্রশ্ন বড় হয়ে উঠল। তার আগে দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের প্রশ্ন নিয়েও নিরাপত্তার দায় এতো বড় হয়ে ওঠেনি। কলকাতায় ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতেও দুর্বৃত্তদের হাতে ছোরা-লাঠির থেকে বেশি মারাত্মক কিছু ছিল না। একটা দো-নলা বন্দুক কোনো বাড়িতে আছে জানলে পুরো পাড়া নিরাপদ বোধ করত। ভারত-চীন যুদ্ধের পরে বামপন্থীদের ঘর ভাঙ্গতে শুরু করল। উত্তরোত্তর চরমতম পথের দিকে দলছুট বামপন্থীরা যেতে লাগল। বিরোধী নিকাশের খেলায় দেশের সরকার ক্রমশ মেতে উঠল। বিরোধীদের অন্তর্বিরোধকে, নিজেদের ভিতরের হানাহানিকে দেশের সরকার সুচতুরভাবে কাজে লাগিয়ে সাধারণ সংসারী মানুষের সমাজের প্রতি আনুগত্য, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা ভেঙ্গে দিতে লাগল। এই চাতুরীর খেলাতে কখনো কখনো সরকারের হাত পুড়েছে। এমন কি কখনো কখনো যে

মুখও পোড়েনি এমন কথা বলা যায় না। সরকারের বা রাজনীতির কোনো বড় মানুষ খোলা গাড়িতে চেপে যেতে পারবেন বলে এখন কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

অথচ ১৯৫৫ সালের সেই অল্প শীতের বিকেল বেলার কথা ভাবুন। দমদমে প্লেন থেকে নেমে যশোর রোড ধরে হয় চিড়িয়া মোড় না হয় বেলগাছিয়া হয়ে শহরে ঢুকতে হত। রাশিয়ার রাজনীতি আর রাষ্ট্রচালনার দুই শীর্ষ ব্যক্তি বুলগানিন আর ক্রুশ্চেভ ঐভাবেই খোলা গাড়িতে চেপে রাজভবন চলেছেন। দুজনের মাঝখানে বসে আছেন জহরলাল। রাস্তার দুদিকে কলকাতার প্রায় সব লোক সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সেই সময়টুকুর জন্য কলকাতার সমবেত জনতার মনে অবধারিত সাম্যবাদ নিয়ে কোনো সন্দেহ আর নেই। পাহাড়ী সঞ্ঘের বীরু, রবি গণেশরা মানিকতলা বাজারের গাড়ি বারান্দার তলাতে জড়ো হয়েছে। ওখান থেকে বাঁ দিকে বিডন স্ট্রীটের মোড় থেকে ডান হাতে ঘুরে ডান দিকে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড় পর্যন্ত অনেকটা জায়গা দেখা যাবে। হঠাৎ গণেশ চেঁচিয়ে উঠল ঐ দেখ পিছনের গাড়িতে রাধু কর্মকার ছবি তুলছে। বম্বের রাজকাপুর স্টুডিওর প্রধান ক্যামেরাম্যান রাধু কর্মকার। বুলগানিনদের গাড়ির ঠিক পিছনের খোলা গাড়ির উপরে একটা বড় ক্যমেরাতে ছবি তুলতে তুলতে চলেছেন। ওঁদের তোলা 'আওয়ারা' ছবি তখন রাশিয়াতে কি জনপ্রিয়। মস্কোর ট্যাক্সি চালকরা তখন নাকি গাড়ি চালাতে চালাতে "ম্যায় আওয়ারা হুঁ" গান গাইছে। কলকাতার মানুষদের থেকে এসব কথা দেশের অন্য জায়গায় কেউ বেশি জানে না। সব কিছুর মধ্যে কলকাতার মানুষরা কমিউনিজম যে অবধারিতভাবে আসছে সেটা সবার আগে বুঝতে পেরে গেছে।

সেটা প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষ বছর। অনগ্রসর দেশের সব থেকে বড় অভাব হল পুঁজির। রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদর্শে দেশের পরিকল্পনা রচনা করা হচ্ছে। পুঁজি বাড়াবার জন্য সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হবে। বর্তমানের ভোগ যতটা সম্ভব নিয়ন্ত্রণে রাখবার জন্য উৎপাদন ক্ষেত্রের বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের গুরুত্ব আরও বাড়াতে হবে। জহরলাল কারখানা তৈরির ব্যাপারে, কারখানাতে জিনিস তৈরির ব্যাপারে নতুন নতুন শিল্পনীতি প্রণয়ন করে উৎপাদন-বাণিজ্যে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার বাড়াচ্ছেন। এর সঙ্গে সঙ্গে জহরলাল ঘোষণা করছেন এই সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি তৈরি হল। তারপরে বললেন এইবার পুরোপুরি সমাজতন্ত্র হয়ে গেল। এতে কলকাতার বাঙালিদের মত এতো খুশী বোধ হয় আর কেউ হয়নি। সমাজতন্ত্র যখন হয়েই গেছে তখন ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপাদন কেন্দ্রগুলি তো তুলে দিলেই হয়। সরকারি আপিসে বসে শুধু গণআন্দোলন আর গণনাট্যের মহড়া দিতে হবে। বণ্টন নিয়ে, কে খেতে পাচ্ছে আর কে খেতে পাচ্ছে না, কে বাস্তুহারা আর কে নয়, কোন জমিতে কে দখল নিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই করছে, এসব ভাবার দায়িত্ব তো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের, আমার সমাজের নয়।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে সব থেকে উল্লেখযোগ্য খসরা তৈরি হয়েছিল দ্বিতীয় যোজনাতে। সেটির কাল শুরু হল ১৯৫৬-র মাঝামাঝি থেকে, খসড়া তৈরি করলেন পদার্থবিদ-পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। কোনো অর্থনীতিবিদ নন। প্রশান্তচন্দ্র

ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ অনুগামী। রবীন্দ্রনাথ নিজের একান্ত ব্যক্তিগত আবেগ প্রায় কখনই প্রকাশ করতেন না। সামান্য দু-একটা ব্যতিক্রম যা ঘটেছিল সেটা প্রশান্তচন্দ্রর কাছেই। তার ফলে আন্তর্জাতিক স্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট' গড়ে তার মধ্যে আমবাগান তৈরি করলেন, হাতের কাজের কেন্দ্র গঠন করলেন। আমবাগানের নাম দিলেন 'আম্রপালি', তাঁত কেন্দ্রের নাম দিলেন 'কল্যাণশ্রী'। স্বামী-স্ত্রী— নির্মলকুমারী বা রাণী মহলানবীশ আর প্রশান্তচন্দ্রর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সখ্য ছিল মেধা আর রসচারণায় সমৃদ্ধ। সেই সমৃদ্ধ সম্পর্কের স্বাদ এঁদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলি পড়লেই পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের অনুচরদের কাছে লেখা তুলনীয় ঐশ্বর্যময় চিঠি আমি দেখিনি। এদেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সব দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ মডেলটি রচনা করেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র। এই মডেলটি দিয়ে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাঠামো নির্ধারিত হল। তাত্ত্বিক বিচারেও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের বিষয়ে মহলানবীশের মডেলটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিল।

সেই ষাট-সত্তর বছর আগে সব দিক থেকেই ভারতবর্ষ অনগ্রসর ছিল। অনগ্রসরতার কথা পুষ্টির অভাব, শিক্ষার অভাব, গড় পরমায়ুর স্বল্পতা, শিল্পজাত দ্রব্যর ঘাটতি ইত্যাদি নানা দিক থেকেই তোলা যায়। কিন্তু সব অভাব সব রকম অসামর্থ্যের মূলে থাকে মূলধনের অভাব। অপ্রতুল মূলধন থেকে কম জাতীয় আয়— কম জাতীয় আয় থেকে কম সঞ্চয়— কম সঞ্চয় থেকে কম বিনিয়োগের যোগ্যতা ও কম আয়— এইভাবে দুষ্টচক্রের মধ্যে অনগ্রসর দেশের অর্থনীতি আটকে থাকে। সেখান থেকে প্রয়াস একটু একটু করে বাড়িয়ে ক্রমশ মূলধন আর আয় বাড়ানোর রাস্তা ধরা যায় না। সামান্য আয় বাড়লে আশা করা যায় যে প্রথমে খাদ্য ও চিকিৎসা একটু সহজলভ্য হবে আর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহার কমে গিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যাবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়লে অর্থাৎ লোকসংখ্যা বেড়ে গেলে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমে গিয়ে সঞ্চয়ের ক্ষমতা, মূলধন গঠনের ক্ষমতা আবার কমে যাবে। সেইজন্য গোড়াতেই দ্রুত হারে মূলধন বাড়িয়ে অর্থনীতিকে একটা বড়সড় ধাক্কা দেওয়ার দরকার হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে ছাড়িয়ে যাওয়া দরকার। সাধারণভাবে ভাবা হয়ে থাকে যে শারীরতাত্ত্বিক হিসাবে জন্মহারের গড়পড়তা সর্বোচ্চ হার হল ৪ শতাংশ। মৃত্যুহার ৪ শতাংশ হলে জনসংখ্যা একটা স্থিতাবস্থায় থাকে। সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহার যত কমতে থাকবে অপরিবর্তিত জন্মহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তত বাড়তে থাকবে। এদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বছর কুড়ি এই রকমই ঘটেছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়তে বাড়তে ২.৫ শতাংশ হয়ে গিয়েছিল। জনসাধারণ সচ্ছলতা সম্বন্ধে সচেতন হলে, জন্মনিয়ন্ত্রণের চেতনা ও সুযোগ সুবিধা প্রসারিত হলে মৃত্যুহারের সাথে সাথে জন্মহারও কমতে থাকবে। সম্প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৭ শতাংশতে কমে এসেছে। অবশ্য এত বড় দেশ ভারতবর্ষের সব জায়গায় সব কিছু এক রকমের নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সব থেকে সফল রাজ্য হল কেরালা। অতি মাত্রায় পশ্চাৎপদ হল হিন্দিভাষী রাজ্যগুলি। শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয়,

কাজে উদ্যম, প্রশাসনে শৃঙ্খলা ইত্যাদি বিভিন্ন দিক থেকে দেখলে দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের চরিত্র ভিন্ন। এইভাবে দেখলে পরিবার, সমাজ, রাজনীতি নিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্থাৎ কাছের থেকে দেখা কথাকে গুরুত্ব দিলে একটা রাজ্য বা অঞ্চলের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। রকের আড্ডায় বসে কথা চালাতে হলে বাংলা আর বিশেষ করে কলকাতার ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয়। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। শহর কলকাতার শৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা যে পুরো পশ্চিম বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার নিয়ামক সেটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। সাল তারিখ মিলিয়ে নেবার জন্য আধুনিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের বাংলা বই-এরও অভাব নেই। সে সব পণ্ডিতদের ব্যাপার, নামী অধ্যাপকদের লেখা। সে রকম লেখাতে নিরপেক্ষতা তথ্যভিত্তিক আলোচনা এই রকম সব ব্যাপারগুলি নিয়ে সতর্ক হয়ে চলতে হয়। রকের গুলতানিতে কোনো সতর্কতার কথা নেই। সেখানে আসল কথা হল নিজের চোখে দেখা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর তার সঙ্গে জুড়ে যায় খানিকটা কল্পনা। এইভাবে আজকাল পণ্ডিতরাও নাকি ভাবনাকে বিস্তৃত করছেন— যে বিস্তারের পোষাকী নাম হল অনুমান ।

আবার উন্নয়নের প্রক্রিয়া, প্রশান্তচন্দ্রর রচিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মডেলের কথাতে ফিরে আসা যাক। পুঁজি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক বৃদ্ধি-বিকাশের সুযোগ বাড়ে এটা কিছু নতুন কথা নয়। সঞ্চয় দিয়েই যে পুঁজির নির্মাণ হয় এটাও পুরোনো কথা। কিন্তু দ্রুত সঞ্চয় বাড়াতে হলে বর্তমানের ভোগ-উপভোগের উপরে টান দিতে হবে। এরপর শিল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে হলে শিল্পায়নের জন্য অত্যাবশ্যক ও শিল্পের বনিয়াদ তৈরির জন্য মৌলিক জিনিসগুলির উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই মৌলিক জিনিসগুলি হল ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, খনিজ তেল, যানবাহন। এগুলির যে কোনো একটির উৎপাদন আবার অন্যগুলির প্রয়োজনমত সংস্থানের উপরে নির্ভর করে। উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবার প্রয়োজনে বনিয়াদ তৈরির জন্য নির্দিষ্ট শিল্পে, অন্যদিকে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারি শিল্পে— অর্থাৎ সব ক্ষেত্রেই মৌলিক উপাদানগুলির যোগান বাড়ান আবশ্যক। প্রথমে সঞ্চয় যখন কম, বিনিয়োগের ক্ষমতা যখন কম, তখন ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি যতটা সম্ভব ঠেকিয়ে রেখে উৎপাদনের মৌলিক উপাদান যেমন বলা হল সিমেন্ট, ইস্পাত, কয়লা, বিদ্যুৎ, খনিজ তেল, যানবাহন জাতীয় জিনিসগুলি বাড়ানোর উপরে মহলানবীশের মডেলে জোর দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে বর্তমানে ভোগ্যপণ্যের অভাব মেনে নিলে ভবিষ্যতে উৎপাদনের বনিয়াদ বা ভিত্তিকে বড় করা যায়। ভোগ্যপণ্যের যোগানে প্রথম দিকে টান দিলেও উন্নয়নের বা বিকাশের ভবিষ্যতের ধারার উপরে বড়সড় ধাক্কা দেওয়া যায়। অবশ্য এইসব অঙ্ক-কষা যুক্তি হিসাব নিকাশ মেনে নিয়েও শেষ পর্যন্ত একটা কথার গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে না। মৌলিক উপাদানই হোক আর ভোগ্যপণ্যই হোক— উৎপাদন প্রক্রিয়া চালিয়ে নিয়ে যাবে তো বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষেরা। অনেক জ্ঞান বিজ্ঞান চষে, অনেক হিসাব নিকাশ করে যে পরিকল্পনা তৈরি করা হল তাতে মানুষের কাজে দক্ষতা বা কাজের দিকে মন বা অভিনিবেশ, মানুষদের মধ্যে একটা কাজের নানা অংশের মধ্যে শৃঙ্খলা বা কাজের গোছ শেষ পর্যন্ত

কাজের ফল বা উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করবে।

বাঙালিরা রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শোষকের নিপাত যাবার গল্পে যতটা আবেগমথিত হয়েছিল পরবর্তীকালে রাশিয়ার পরিকল্পনার যুগের কড়া শৃঙ্খলার কথাটায় ততটা মাথা দেয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা সবাই মেনে নিয়েছিল। যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলির দ্রুত পুনর্নির্মাণের জন্য আর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত অনুন্নত অর্থনীতির বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের উদ্যোগের খুব একটা বিকল্প ছিল না। এই সব উদ্যোগে বড় হারে বিনিয়োগ করবার মত সঞ্চয় অর্থনৈতিক দিক থেকে অনুন্নত দেশগুলিতে ছিল না। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় জাতীয় আয়ের হার হিসাবে সঞ্চয় ছিল মাত্র ৬-৭ শতাংশ। পৃথিবীর দারিদ্র্য যে বিরোধের কারণ এটা উন্নত দেশের রাষ্ট্রনেতারা বুঝেছিলেন। সেইজন্য উন্নত দেশ থেকে ঋণ ও অনুদান দিয়ে অনুন্নত দেশের বিনিয়োগে সাহায্য করবার জন্য নতুন নতুন বহুরাষ্ট্রিক আন্তর্জাতিক সংস্থা তৈরি হতে লাগল। রেলপথ, অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ধরনের পরিকাঠামোর ব্যবস্থা না হলে উৎপাদন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। পরিকাঠামো ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক বনিয়াদ তৈরির জন্য শিল্প প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলির যোগান দিলে এই বনিয়াদের উপরে নির্ভরশীল দ্রব্য ও সেবা নির্মাণের উদ্যোগ হতে পারে। অর্থাৎ পরিকাঠামো ও বনিয়াদ, যেমন বিদ্যুৎ, রেলপথ, বড় রাস্তা, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ, সিমেন্ট, ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে চাহিদার অপেক্ষা না করেই যোগানের ব্যবস্থা করতে হয়। পরিকাঠামোর অস্তিত্ব ও বনিয়াদী শিল্পের যোগানের ব্যবস্থা দেখে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনকারী শিল্প উদ্যোগ চাহিদা নিয়ে আসে। ভবিষ্যৎ চাহিদার কথা আন্দাজ করে বর্তমানে যোগানের জন্য উদ্যোগ নেওয়া রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব। তাছাড়া পরিকাঠামো নির্মাণ আর বনিয়াদী শিল্প স্থাপনের জন্য প্রাথমিক বিনিয়োগের পরিমাণ এত বেশি যে রাষ্ট্র ছাড়া সেই বিনিয়োগের সংস্থানও করা যায় না। দেশের সঞ্চয়ের হার তখন খুব কম হওয়াতে বিদেশি ঋণের উপরে অনুন্নত দেশকে খানিকটা নির্ভর করতে হয়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জামিন বা ঋণশোধে দায়বদ্ধতা না থাকলে বহুজাতিক আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে ঋণ পাওয়া যায় না। বহুজাতিক সংস্থার প্রদত্ত ঋণের উপরে সুদের হার কম থাকে। পরিকাঠামো নির্মাণ আর ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য— সেবা উৎপাদনের মধ্যে, চাহিদা যোগানের পারম্পর্যে, কোনটার উপরে আগে বেশি জোর দিতে হবে এইসব নিয়ে গত শতাব্দীর চল্লিশ আর পঞ্চাশের দশকে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়েছিল। এই সব তর্কের মীমাংসায় বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা না উঠে পারে না। আবার অর্থনীতির কথায় বাস্তব অভিজ্ঞতা সমাজ রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে নির্ধারিত হতে পারে না। এদিক থেকে অর্থনীতি তত্ত্বের তর্ক-বিতর্কের ধারাটা বেশ মজার। নানা ব্যাপারের মধ্যে গাণিতিক যোগ আর নানা সূচকের পরিমাপের আবশ্যিকতার কথা থেকে পুরো অর্থনীতি বিষয়টিকেই পদার্থবিদ্যার সমতুল্য একটা বিজ্ঞান বলে অনেকে ভেবেছে। অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই গণিতজ্ঞ পদার্থবিজ্ঞানীরা বড় বড় আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু অন্য দিকে অর্থনৈতিক সমস্যা আর সমাধান তো দেশ, কাল নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়। গত

শতাব্দীর তিরিশের দশকে অর্থনীতিতে বিশ্লেষণ পদ্ধতির বিষয়ে একজন খুব বড় প্রবক্তা— 'লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকসে'র অধ্যক্ষ লায়নেল রবিন্স— নৈতিকতার বিচারের ব্যাপারে নিরপেক্ষভাবে, মূল্যবোধের প্রশ্ন না তুলে অর্থনীতির তত্ত্ব রচনার কথা বলেছিলেন। আবার অন্য দিকে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই সমাজতাত্ত্বিক ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত অর্থনীতির চর্চা চলেছিল। সেই পক্ষের প্রবক্তাদের কাছে দেশ কাল নিরপেক্ষভাবে নৈতিক বিচার বিবেচনার ছোঁয়া বাঁচিয়ে অর্থনীতির বিশ্লেষণ করা যায় না।

আমরা কলকাতার রকে বসে গত ষাট-সত্তর বছর ধরে কত কিছু প্রত্যক্ষভাবে ঘটতে দেখলাম। কিন্তু এই দেখাতে পশ্চিমবঙ্গ আর শহর কলকাতার কথা যতটা আছে সারা ভারতবর্ষের কথা ততটা নয়। একটি রাষ্ট্র হিসাবে ভারতবর্ষের নীতি পরিকল্পনা রচনা করা হয়। সমস্ত দেশের জাতীয় আয়, বিনিয়োগ, মূল্যস্তর, বাণিজ্য ঘাটতির পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়। কিন্তু ভাষাগত দিক, নৃতাত্ত্বিক দিক এই রকম নানা দিক থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের প্রবণতা, উদ্যোগ, পছন্দ বিভিন্ন রকম। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ম কানুন সারা দেশের জন্য এক রকম হলেও প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্য সরকারগুলির কাজকর্মের গুরুত্ব অনেক বেশি।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহলানবিশের মডেলে প্রথমে দুটি উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে সমস্ত অর্থনীতিকে ভাগ করে দেখা হয়েছিল। তারপরে মহলানবিশ সমস্ত অর্থনীতিকে চারটি উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে ভাগ করে মডেল পুনর্নির্মাণ করলেন। এখানে ভারী বনিয়াদি শিল্প ছাড়া বাকি তিনটি ক্ষেত্র হল— আধুনিক যন্ত্রচালিত ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র, কৃষি ও কারুশিল্প নির্ভর ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র ও সেবামূলক পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্র। তৃতীয় ক্ষেত্রে শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ বেশি থাকবে। চতুর্থ ক্ষেত্রের মধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশাসন ইত্যাদি আসবে। পরবর্তীকালে উৎপাদন ক্ষেত্রগুলির আরও বেশি বিভাজন করে আর বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে উৎপাদনের উপাদান আর উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে প্রক্রিয়াগত সম্পর্ক বিচার করে জটিলতার পরিকল্পনা তৈরি হল। সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থাকে ষাটটি বা তার থেকেও বেশি ক্ষেত্রে ভাগ করে অঙ্ক কষা হতে লাগল। এই ধরনের বিশাল বিশাল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মডেল রাশিয়াতে কম্পিউটার দিয়ে রচনা করা হচ্ছিল। এর ফলে রাশিয়াতে এক দিকে পরিকল্পনা সম্পর্কিত গণিত আর অন্য দিকে কম্পিউটার যন্ত্রের প্রযুক্তির গবেষণা দ্রুত এগিয়ে চলল। রাশিয়াতে তখন তুলনীয় গণিত ও কম্পিউটার প্রযুক্তির সাহায্যে মহাকাশ গবেষণাও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে'র কলকাতার ক্যাম্পাসে রাশিয়া থেকে বিশাল 'উরাল' নামের কম্পিউটার এনে বসানো হল।

কিন্তু এই ধরনের গাণিতিক বিচারে নির্ধারিত যোগান ব্যবস্থা দিয়ে অর্থনীতি পরিচালনা করতে হলে চাহিদাকে আলাদাভাবে কোনো গুরুত্ব দেওয়া যায় না। অর্থাৎ সাধারণ অর্থে চাহিদা যোগানের সমন্বয়ে বাজার নির্ধারিত ব্যবস্থাকে যতটা সম্ভব বাধা দিতে হয়, সরিয়ে রাখতে হয়। জীবনযাত্রার অভ্যস্ত পছন্দগুলি থেকে মানুষের চাহিদার সৃষ্টি হয়। চাহিদাকে

নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে ভোগ্যপণ্য ও উৎপাদনের উপাদানের পরিমাণের উপরে উৎপাদন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উপরে নানারকম বিধি নিষেধ চাপাতে হয়। আর এদেশে সেটাই সমাজতন্ত্রের নামে করা হতে থাকল। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে বাংলার ভাল ছাত্রদের অধিকাংশ সাম্যবাদী আদর্শে প্রাণিত ছিলেন। মহলানবিশের প্রতিষ্ঠানে সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসী ভাল ছাত্ররা অগ্রাধিকার পেল।

প্রশান্তচন্দ্র কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে আসবার সময় তাঁর একজন শিক্ষকের পরামর্শে 'বায়োমেট্রিকা' পত্রিকা দেখেন। তারপরে জাহাজে দেশে ফিরবার সময় 'বায়োমেট্রিকা'র সব খণ্ডগুলি পড়তে পড়তে আসেন। দেশে ফিরে এসে কৃষি উৎপাদন নিয়ে পরিসংখ্যান ভিত্তিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। কৃষিতে পরীক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কাছে সমদর্শী পরামর্শ পান। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে পরিসংখ্যান গবেষণার ব্যাপারে দিক-নির্দেশ লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতে করতে ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের সময় খাদ্যাভাব ও মানুষের বিপর্যয় নিয়ে প্রশান্তচন্দ্র নমুনা সংগ্রহ করতে থাকেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে তাঁর কাজের জায়গাটির নাম দিয়েছিলেন 'পরিসংখ্যান গবেষণাগার'।

এইভাবে 'জাতীয় নমুনা নিরীক্ষণ' বা 'ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে অরগানাইজেশন' গঠন করেন। বর্তমানে এই সংস্থাটি ভারত সরকারের একটি প্রতিষ্ঠান। এদের কাজ হল সমস্ত দেশের মানুষের ভোগ ও কর্মনিযুক্তি-বেকারত্বর পরিসংখ্যান বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগ্রহ করে প্রকাশ করা। এছাড়া ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে জাতীয় আয় পরিমাপের কাজ চলতে থাকে। প্রশান্তচন্দ্র নিজে পদার্থবিদ্যা থেকে পরিসংখ্যান, সেখান থেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনায় চলে গেলেন। তাঁর পরামর্শদাতা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল দর্শন থেকে বিজ্ঞানের নানাক্ষেত্রে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে অভিযান করে বেড়াতেন। এঁদের ঘনিষ্ঠ মানুষ রবীন্দ্রনাথের তো বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার প্রবণতা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। দেশ স্বাধীন হবার পরে অর্থনৈতিক বিকাশের কাজে উৎসাহিত হয়ে মেধাবী তরুণরা শুধুমাত্র জ্ঞানের সঙ্কীর্ণ অধীত ক্ষেত্রের মধ্যে নিজেকে বেঁধে না রেখে মানুষের সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনুসন্ধানের পথে যাত্রা করবেন বলে মহলানবিশের মনে হয়েছিল। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী ভাবনায় প্রাণিত তরুণরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানে সংস্কারের বেড়া ভাঙতে পারে। কিন্তু বাস্তবপক্ষে প্রশান্তচন্দ্রের এই আশা পূরণ যে খুব একটা হয়েছে এমন মনে হয় না।

রকে বসে সকালের চা থেকে গুলতানি শুরু হয়ে গেল। বুজি দত্তর রকের এক কোণে কানাই বসে চা বানাচ্ছে। ইতিমধ্যে কলকাতা বাংলার কত ঝড়ের কত পালা বদলের সাক্ষী হয়ে রইল। হঠাৎ ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট থেকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুনলাম মানিকতলায় মুসলমানরা দোকান বন্ধ করতে গিয়ে কোন হিন্দুর নাকি মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছে। মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দী নাকি রাজাবাজারের মুসলমান গুণ্ডাদের দাঙ্গার প্ররোচনা দিয়েছে। ঠাকুর্দার কাছে শুনলাম হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা লেগেছে। আমরা যে হিন্দু একথা ছোটবেলায় সেই প্রথম শুনলাম। এর আগে পশ্চিম থেকে যে সব মানুষরা খেটে খেতে আসত তাদের

শুধু হিন্দুস্থানী বলা হত। সে দিক থেকে ভাবতে গেলে কলকাতার বাঙালিদের থেকেও অবাঙালিরাই নানাভাবে দাঙ্গার মধ্যে পড়েছিল। রাজাবাজারের কলাবাগান বস্তির মুসলমানরা অধিকাংশই ছিল অবাঙালি। আর বাঙালি হিন্দু পাড়ার প্রান্তবাসী গরীব খেটে-খাওয়া অধিকাংশ তথাকথিত হিন্দুস্থানীদের উপর দিয়ে দাঙ্গার প্রথম চোটটা গেল। তিন দিন শহর থেকে প্রায় সব প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিষ্ক্রিয় করে হিংস্রতার লাগাম পুরো খুলে দেওয়া হল। সেখান থেকেই প্রশাসনের প্ররোচনায়, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত স্বেচ্ছানিষ্ক্রিয়তায় হিংস্রতার শুরু। তারপরে ১৯৭১-এর বরানগর। তারপরে বানতলা। নারীর শ্লীলতা ধ্বংস করে হিংস্রতায় প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তার মাত্রা এখান থেকে যোগ হল। ক্রমশ বাঙালি সমাজ হারিয়ে যেতে লাগল।

গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে বাঙালিরা বিলেত থেকে কমিউনিস্ট হয়ে ফিরল। দেশের সমস্যা বুঝবার জন্য বাঙালি তরুণ রাশিয়ার দিকে মুখ করে মার্কসীয় পুথিতে অভিনিবিষ্ট হল। বিলেত থেকে ফিরে দেশের জন্য পরিসংখ্যান গড়ে তোলা, দেশের জন্য প্রযুক্তি নির্মাণ, দেশীয় কারখানাতে উৎপাদন করার ভাবনা প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, মেঘনাদ সাহাদের মত গত শতাব্দীর বিশের দশকে বিলেত প্রত্যাগতদের মধ্যেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এদের পরে বিলেত থেকে যে সব বাঙালি তরুণরা লেখাপড়া করে আসতে লাগলেন তাদের নিয়ে কী চূড়ান্ত উপহাস রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে, 'বাঁশরী' নাটকে। লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের ডিরেক্টর লায়নেল রবিন্স মতাদর্শজনিত মূল্যবোধ থেকে অর্থনীতিকে বিযুক্ত করে দেখতে বলেছিলেন। রবিন্সের বাঙালি ছাত্র এদেশে তাত্ত্বিক অর্থনীতির প্রথম প্রাজ্ঞ বলে স্বীকৃত মানুষ হাঃ হাঃ করে হেসে বললেন— ভি কে আর ভি থিওরি জানে না। মহীশূরের তরুণ ভি কে আর ভি রাও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম শ্রেণীর স্নাতক হয়ে দেশে ফিরে ভারতবর্ষের জাতীয় আয় পরিমাপের প্রথম উদ্যোগ করলেন। ভারতবর্ষের মত কৃষিপ্রধান, স্বনিযুক্ত অনেক মানুষের কাজকর্ম নিয়ে এক অনুন্নত দেশের জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য ভি কে আর ভি রাওকে ভাবনার, পরিমাপের পথ উদ্ভাবন করতে হল। প্রশান্তচন্দ্র তাঁর ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্স্টিটিউটে কোনো কোনো তরুণকে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে নিযুক্ত করলেন। অবশ্য তাঁর নিয়োজিত সব আধুনিক মেধাবী বাঙালি তরুণের দৃষ্টিকে তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতামুখী করতে পারেননি। মার্কসের পুথি ঘেঁটে টিপু সুলতানের রাজত্বের মধ্যে ফ্রান্সের তৃতীয় নেপোলিয়নের 'ফিনান্স ক্যাপিটাল' ভিত্তিক ধনতন্ত্র খুঁজে বেড়ানোতে এঁরা বেশি আনন্দ পেয়েছেন। অন্যদিকে তখন রাজনীতির আঘাতে সমাজ ভাঙছে। সংস্কার মুক্ত হবার নামে ব্যক্তি পেশা-নির্ভর, স্বাতন্ত্র্যের নামে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠছে। কলকাতার অলিগলি ঘুরেই কল্লোল যুগে 'পটলডাঙ্গার পাঁচালি' লেখা হয়েছিল। তারপর মন্বন্তর গেল, দেশভাগের ফলে ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা আর লড়াই গেল। এর ফলে কোথায় সমাজ বিপর্যস্ত হয়ে রাজনীতির কাছে সব কিছু সমর্পিত হল সেটা নিয়ে সংস্কারমুক্ত পেশাদার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে অভ্যস্ত মেধাবী বাঙালীকে কিছু বলতে বা করতে দেখা গেল না। গত শতাব্দীর প্রথম দিকে ঢাকার শহরতলীতে বড়

হয়ে ওঠা, পুরো ছাত্রজীবন ঢাকাতে অতিবাহিত করা মেধাবী মানুষের লেখার কোনোখানে তাঁর শ্বশুরবাড়ীর উদ্বাস্তু জীবনের ছিঁটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঢাকার অবস্থাপন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার দেশভাগে কী শোচনীয় অবস্থায় পড়েছিল প্রতিভা বসুর 'জীবনের জলছবি' পড়লে জানা যায়। মনে পড়ছে ১৯৯৮ সালে বিখ্যাত রাজস্ব বিশারদ জাতিতে তামিল অর্থনীতিবিদ রাজা চেলায়া শান্তিনিকেতনগামী রেলগাড়িতে বসে আমাকে অর্থদ্যোতকভাবে বললেন— "where is nineteenth century Bengal?" (অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলা কোথায় গেল?)। কি করে বলি যে শিক্ষার জগতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ আর মেঘনাদ সাহাতে শেষ হয়ে গেছে। আরও হতাশার কথা হল রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে এসে শেষ হয়ে গেছে।

সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদরা সময়ের হিসাবে বিশ শতকের মানুষ। কিন্তু দেশের বিশ শতকের রাজনীতির মূল ধারায় তারা থাকতে পারেননি। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে গণতন্ত্রের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা দুর্ভাগ্যজনকভাবে জড়িয়ে গেল। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত মানবধর্ম বিকাশের যে উদ্যোগ চলেছিল তার মধ্যে সব ধর্মের সব সম্প্রদায়ের সশ্রদ্ধ সহাবস্থানের স্বীকৃতি ছিল। সেখানে সম্প্রদায় সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপার ছিল। সম্প্রদায়কে বিষিয়ে সাম্প্রদায়িকতা তখন রাজনীতির অস্ত্র করা যাবে বলে কেউ ভাবেনি। মতাদর্শ নিরপেক্ষ অর্থনীতি নিয়ে যারা সুখে জীবন কাটাতে পারবেন তাদের সুখে থাকতে দিন। তাদের জন্য অন্য রকে আড্ডা যেমন চলেছে চলুক। গত ষাটসত্তর বা তারও বেশি কালের অর্থনীতির ইতিহাসে রাজনীতির ধাক্কা খেতে খেতে সময় গড়িয়েছে। এদেশের রাজনীতি সাম্প্রদায়িক বিষে ক্রমশ জর্জরিত হয়েছে। একথা ভারতবর্ষ রাষ্ট্রের জন্য যতটা সত্যি তার থেকেও অনেক বেশি সত্যি বাংলার বেলাতে। দেশভাগের ধাক্কা থেকে আজও বাংলা মুক্ত হতে পারেনি। বাংলার দেশভাগের ইতিহাস, সম্প্রদায় নিয়ে সমাজের ইতিহাস থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে পরিণতির ইতিহাস। সম্প্রদায় নিয়ে সামাজিক সম্পর্ক রচনায় শেষ সার্থক রাজনৈতিক মানুষ চিত্তরঞ্জন দাশ। মৌলানা ভাসানীর স্মৃতিচারণ এখানে মনে করতে বলব। সামাজিক সম্পর্কের আবহে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রয়োজনগুলি নিয়ে বাংলার মুসলমান নেতাদের মধ্যে ভাবতে পারতেন ফজলুল হক। দূর থেকে রাজনীতির দড়ি টানাটানির লড়াইতে জিন্না, মৌলানা আজাদ, জহরলালের মত সর্ব ভারতীয় নেতারা বাংলায় ফজলুল হকের সব সম্প্রদায়ের সমাজ নিয়ে চলবার প্রচেষ্টাকে সুরাবর্দীর বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আবর্তে নিক্ষেপ করল। বাংলার শোচনীয় পরিণামে সুরাবর্দীর অবদানের শেষ নেই। কলকাতায় ১৯৪৬-এর দাঙ্গা বাধানোর আগে ১৯৪৩-এ মুসলিম লীগ নেতা, ঢাকার নবাব বাড়ীর ভাগনে নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রীসভায় সুরাবর্দী ছিলেন সরবরাহ মন্ত্রী। তখন বাংলায় বড় ব্যবসায়ী ইস্পাহানীর ব্যবসার একটা বড় অংশ ছিল ভোগ্যপণ্যর সরবরাহ ও মজুতদারি। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে অন্নাভাবে গ্রাম থেকে শহরে এসে অন্তত পনেরো লক্ষ লোক রাস্তায় পড়ে মারা গিয়েছিল। সেই মন্বন্তর যে অনেকটাই লোভী মানুষের চক্রান্তের পরিণাম এটা আজ প্রমাণিত। কিন্তু সেই লোভী মানুষ কারা, তাদের মধ্যে

কারা বৈষয়িক লাভের হিসাবের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ মিশিয়েছিল তার কোনো সমীক্ষা হয়নি। ফজলুল হককে কংগ্রেসের সমর্থনের জন্য সুভাষচন্দ্র যখন গান্ধীজীকে অনুরোধ করলেন তখন মৌলানা আজাদের সঙ্গে বাংলার হিন্দু ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সেখানে বাধা দিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টায় আসামে কংগ্রেস নেতৃত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল । কিন্তু সব কটি দল উপদলের মধ্যে সব থেকে বেশি আসন পেয়েও বাংলাতে কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভায় আনা গেল না। তখন ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে কলকাতা ছিল বম্বের সমকক্ষ। কলকাতার স্টক এক্সচেঞ্জ অখণ্ড ভারতবর্ষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্টক এক্সচেঞ্জ ছিল। এখন বোধ হয় কলকাতার স্টক এক্সচেঞ্জ অচল হয়ে গেছে। ফলে তখনকার কালে কলকাতার রাজনীতিতে কংগ্রেসের সভাপতির থেকেও ব্যবসায়ীদের কথার গ্রহণযোগ্যতা মহাত্মা গান্ধীর কাছে বেশি ছিল। তখন হিন্দু ব্যবসায়ীরা এখানে বোধ হয় ইস্পাহানীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন। সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে ফজলুল হকের সামাজিক সম্পর্ক ছিল। কৃষিতে গরীব রায়তের স্বার্থের দিকে তাঁর চোখ ছিল। কৃষিতে মধ্যস্বত্বভোগীদের হাত থেকে রায়তকে মুক্ত করবার জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী মশাই অনেক আগে থেকেই রায়তের স্বার্থের স্বপক্ষে লিখছিলেন। এটা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্কে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন বাংলার জমিদারদের অধিকাংশই হিন্দু আর রায়তরা অধিকাংশ হলেন মুসলমান।

কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আর কংগ্রেসের উপরে প্রভাবশালী বড় ব্যবসায়ীদের কাছে পরাজিত ফজলুল হক মুসলিম লীগের সঙ্গে সরকার গঠন করতে বাধ্য হলেন। প্রত্যাশিতভাবেই সেই সরকার টিকল না। বরিশাল শহরের কংগ্রেস সমর্থক, সম্ভ্রান্ত ও আধুনিক হিন্দু পরিবারের ফজলুল হকের ছোটবেলার বন্ধুরা যখন নিন্দা করে বললেন— 'ফজলু তোর জন্য মানুষের কাছে মুখ দেখাতে পারি না'। ফজলুল হক তখন মিষ্টি করে বলেছিলেন— 'হেইলে হোগা দেহাইস'। নিম্নাঙ্গের এত মিষ্টি উল্লেখ বরিশালের মানুষের মুখেই সম্ভব।

বড্ড বেশি পুরানো কথা হয়ে যাচ্ছে। কোথায় ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, আর্থিক সংস্কার, অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কথা পড়ে রইল। ধান ভানতে শিবের গীত। কিন্তু বাংলার অর্থনীতির কথায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা ভুলে গেলে কি চলবে? সাম্প্রদায়িক রাজনীতি না হলে বিশিষ্ট মুসলমান মানুষদের নামে রাস্তা কি শুধু মুসলমান প্রধান অঞ্চলেই হবে? এমন কি মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের নামেও? কিন্তু লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় যখন দেখি যে কলকাতার কেন্দ্রে একটা বড় রাস্তা সুরাবর্দীর নামে আর ফজলুল হকের নামে পিছনের ঘিঞ্জি ঝাউতলা রোড। এটা নিয়ে প্রশ্ন করাতে কে একজন বল্লেন যে ফজলুল হক ঝাউতলা রোডে থাকতেন। তাহলে ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলামের গলির নাম কিরণশঙ্কর রায় রোড না করে সেক্রেটারিয়েটের বড় রাস্তার নাম কেন করা হল? অবিভক্ত বাংলায় সব সম্প্রদায়ের সঙ্গে সামাজিক সখ্য স্থাপন করে নিজের ক্ষমতায় ফজলুল হক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অন্য কোনো দলের কোনো নেতা ইংরাজ সরকারের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এটা

করতে পারেননি। সেক্রেটারিয়েটের পাশের রাস্তা কিরণশঙ্কর রায়ের নামে না হয়ে ফজলুল হকের নামে হওয়া উচিত ছিল। দেশভাগের সময় তখনকার বিধান পরিষদের কংগ্রেস নেতা ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়। এতদ্‌সত্ত্বেও গান্ধীজী স্বাধীন ভারতবর্ষে মুখ্যমন্ত্রী করলেন অভয় আশ্রমের প্রফুল্ল ঘোষকে। আর কিরণশঙ্কর রায়কে অবিভক্ত বাংলায় তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্র ঢাকার মানিকগঞ্জে থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিধান পরিষদে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিতে বললেন। কিন্তু কিরণশঙ্কর রায় তো সতীন সেন নন। গান্ধীজীর মৃত্যুর মাসখানেকের মধ্যে কলকাতায় চলে এলেন। এখানে এসে বিধান রায়ের মন্ত্রীসভাতে স্বরাষ্ট্রের ভার নিয়েই কিরণশঙ্কর রায় কমিউনিস্ট পার্টিকে পশ্চিম বাংলায় বেআইনী ঘোষণা করে বসলেন। এটাতে জহরলালকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়তে হয়েছিল। অবশ্য কিরণশঙ্কর রায় তারপরে বেশি দিন বাঁচেননি।

সম্প্রদায় আর সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি বরাবরই বিভ্রান্তির মধ্যে কাটিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় থেকেই কমিউনিস্ট পার্টি দেশভাগ সমর্থন করেও বিভিন্ন ভাগগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে নানা কথার গোলকধাঁধার মধ্যে পাক খাচ্ছিল। এইজন্যই তরুণ কমিউনিস্ট নেতা কলকাতার ডক আর ট্রাম কোম্পানির মুসলমান প্রধান শ্রমিক সংগঠনের শোভাযাত্রা নিয়ে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট গড়ের মাঠে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের (direct action) সভাতে যোগ দিয়েছিলেন । পিছনে সুরাবর্দী যে সমস্ত প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে তিন দিনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছেন সেটা কমিউনিস্ট পার্টির কল্পনার অতীত ছিল। আসলে কমিউনিস্ট পার্টি কখনই বাস্তব অবস্থার পরিষ্কার ধারণা সংগ্রহ করতে পারেনি। কলকাতার ছেচল্লিশের দাঙ্গা, দেশভাগ আর উদ্বাস্তু সমস্যা দুর্বুদ্ধি আর অদূরদর্শিতার পরিণাম। দেশ স্বাধীন হল কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধ শহরের মর্যাদা থেকে কলকাতা দ্রুত একটা সমস্যাক্লিষ্ট জনবসতিতে পরিণত হল। পরিবেশের অবনতি উৎপাদন ব্যবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পঙ্গু করে দিতে বাধ্য। কলকাতার পরে আর দ্বিতীয় কোনো আধুনিক পরিকাঠামো সম্পন্ন মহানগরী পশ্চিম বাংলাতে তৈরি করা গেল না। গত শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকেই বাঙালি সমাজের বাঁধন শিথিল হতে শুরু করেছে। পেশা দিয়ে চিহ্নিত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠী সমাজের জায়গা দখল করে বসতে লাগল। কিন্তু আধুনিক নগরকেন্দ্রিক জীবনযাত্রার পরিপূরক কোনো সুষ্ঠু, দক্ষ প্রশাসন ও আইনী ব্যবস্থা গড়ে উঠল না। যানবাহন, নানা রকমের সেবা, বাস্তব পরিকাঠামো, পরিবেশ মিলে একটা সামগ্রিক উৎপাদন বা আয় সৃজনের দক্ষতা তৈরি করে। এই ধরনের সর্বোপরি সমন্বয় অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বা উন্নয়নের একটা আবশ্যিক শর্ত।

দেশ স্বাধীন হবার সময় ভারতবর্ষে বিনিয়োগ ছিল জাতীয় আয়ের ৭ শতাংশ। বিনিয়োগ না বাড়লে জাতীয় আয় বাড়বে না। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতির সাথে সাথে বিনিয়োগের হার তিন দশকে জাতীয় আয়ের ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেল। গত শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে অর্থনীতিতে বড় ধাক্কা দেবার ভাবনাতে স্বপ্রণোদিত বৃদ্ধি ও বিকাশের ভাবনাতে বড় বিনিয়োগের উপরেই জোর দেওয়া হত। কিন্তু ভারতবর্ষের বেলাতে কি

হল? বিনিয়োগের হার তিন গুণ ছাড়িয়ে গেলেও, অর্থাৎ ৭ শতাংশ থেকে তিন দশকের মধ্যে ২০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার গড়পরতা ৩.৫০ শতাংশই থেকে গেল। পরিকল্পনা কমিশনের লক্ষ্য যেখানে ধরা হত ৫ থেকে ৫.৫০ শতাংশ, প্রাপ্তি সেখানে ৩.৫০ শতাংশ। মানুষের সুখ সমৃদ্ধির বিকাশে দেশের উদ্যোগ আশানুরূপ ফল দিতে পারছে না।

দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ অসংগঠিত অনেক ক্ষেত্রেই স্বনিযুক্ত প্রচেষ্টায় খাওয়া-পরার সংস্থান করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য বস্তু যোগাড় করতেই অধিকাংশ মানুষের সামর্থ্যর সবটুকু ব্যয় হয়ে যায়। খাদ্যশস্য উৎপাদনের অগ্রগতির উপরে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনযাত্রা ও কর্মক্ষমতা অনেকখানি নির্ভর করে। কৃষির উৎপাদনে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য যেখানে ছিল ৪ শতাংশ সেখানে গড়পড়তা প্রাপ্তি হল মাত্র ২.৫০ শতাংশ। অন্যদিকে পরিকল্পনামাফিক রোগ-প্রতিষেধক ব্যবস্থার উন্নতির ফলে, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাকে গুছিয়ে তোলার ফলে মৃত্যুহার কমে গিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেড়ে যেতে লাগল। জন্মহারের লক্ষ্যমাত্রার থেকে বাস্তব জন্মহার বেশি থাকছে। সব মিলে বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আর দারিদ্র্য, অপুষ্টিতে বিপুল আকারের অসংগঠিত ক্ষেত্রের মানুষ পীড়িত বিপর্যস্ত হয়ে আছে।

কত মানুষ অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে? অনাহারে কত মানুষ মারা গেল? এসবের হিসাব প্রথম শুরু করলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। তিনি এদেশে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের পথপ্রদর্শক। বিষয় নির্বাচনে 'ছিন্ন' পত্রাবলীর কবি রবীন্দ্রনাথকে পরোক্ষভাবে প্রশান্তচন্দ্রের দিশারি বলে স্বীকার করতেই হবে। আর আশ্চর্য ব্যাপার হল দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল পশ্চিমের পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের সব দিকগুলি আয়ত্ত করে বসে আছেন। তিনি হলেন প্রশান্তচন্দ্রের পরামর্শদাতা। যদিও বিশ শতকের তিন-চার দশক তখন পেরিয়ে গেছে, কিন্তু ভাবের জগতে তখনো বয়ে চলেছে nineteenth century Bengal। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের মানবধর্ম, রবীন্দ্রনাথের Religion of Man। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার বিভাগ গড়ে তুললেন। কালক্রমে দেশের সরকার সেই বিভাগকে একটি কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠনে পরিণত করল। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের এক বিস্ময়কর চেহারা ছিল। পরিসংখ্যান, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের পৃথিবীর দিকপাল মানুষরা ওখানকার গ্রন্থালয়ে তন্ময় হয়ে লেখাপড়া করছেন। পৃথিবীর এত বিভিন্ন ভাষায় অত রকমের পত্র-পত্রিকা দেশের আর কোথায় পাওয়া যেত? ঐ রকম গোছানো গ্রন্থালয়ের জন্য নিবেদিতপ্রাণ গ্রন্থাগারিককে কোনো এক আদর্শে প্রাণিত করবার ক্ষমতা প্রশান্তচন্দ্রের ছিল।

জনসংখ্যার অপ্রত্যাশিত হারে বৃদ্ধি, খাদ্যশস্যর অভাব, চাহিদার নানা দিকে প্রসার সব মিলে অপরিহার্যভাবে জিনিসের দাম বাড়তে লাগল। আজ থেকে বছর ত্রিশেক আগে বৈঠকে, এখন যাকে ঠেক বলে, সেখানে এসে বুলাদা (মানে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটের গ্রন্থাগারিকের ভাই কল্যাণ সাহা) হেঁকে বললেন— "অনুপম, এখন

তেলাপিয়ারও পৈতে উঠেছে।" সত্যিই তো। তাছাড়া বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে দাম বাড়ার হারও তো সমান থাকছে না। পাইকারি বাজারের মূল্যবৃদ্ধির হিসাব সরকারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলিও রাখছে। কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয়ের বৃদ্ধি তো পাইকারি বাজারের মূল্যবৃদ্ধির হারকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পাইকারি বাজারের মূল্যস্তরের হিসাবে উৎপাদনের উপাদানগুলির দাম ধরা হয়, সেবামূলক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি ধরা হয় না, তাছাড়া খাদ্যদ্রব্যের দামের উপরে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অন্য দিকে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সূচক মাপতে গেলে এর ঠিক উল্টো করা হয়। খাদ্যদ্রব্যর গুরুত্ব সেখানে অনেক বেশি, সেবামূলক প্রয়োজনের কথা ভাবা হয় আর উৎপাদনের উপাদান হিসাবের মধ্যে আনা হয় না। দেশে চতুর্থ পরিকল্পনার সূচনার আগেই বীমা, বড় বড় ব্যাঙ্কগুলির জাতীয়করণ করা হয়ে গেছে। অর্থনীতির বাস্তব আর আর্থিক সব দিকেই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। পরিকল্পিতভাবে বিনিয়োগ আর উৎপাদন অর্থাৎ যোগানের পথে বিকাশের প্রচেষ্টা চলেছে। কেন্দ্রীয় ব্যঙ্ক অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া মূলতঃ বিনিয়োগের ঘাটতি মেটানোর জন্য নগদ টাকার যোগান দিচ্ছে। ভারী ও বনিয়াদি শিল্পের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হচ্ছে। এছাড়া খনিজ তেলের উৎস দেশের মধ্যে আবিষ্কার হলেও প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমদানি করতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি, বিদেশি মুদ্রার ক্রমবর্ধমান অভাব পরিকল্পনার প্রথম থেকেই চলছিল। বিদেশি মুদ্রার অভাব থাকলেও টাকার সঙ্গে বিদেশি মুদ্রার বিনিময় মূল্য নানা ভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নির্দেশে বেঁধে রাখা হচ্ছিল।

এতসব কড়াকড়ির ফলে যা হবার তাই হল। উৎপাদন ব্যবস্থার দক্ষতা হ্রাস পেল। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে লাভের থেকেও সামাজিক মান পূরণ করা যে বড় কথা এটা জহরলাল স্মরণ করিয়ে দিতেন। কিন্তু সেই সামাজিক মানের সূচকটা কি হতে পারে কেউ জানে না। ফলে উৎপাদনে লাভ বা উদ্বৃত্ত সৃজন জলাঞ্জলি গেল। তবে বনিয়াদি শিল্পের ভিত্তি যে ব্যাপকভাবে হল এটা অস্বীকার করা যাবে না। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প থেকে বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ সৃষ্টি আশানুরূপ হল না। কিন্তু সরকারি নিয়মনীতির জালে এক দিকে উৎপাদন ব্যবস্থায় অবশ্যম্ভাবীভাবে শ্লথতা এলো। অন্যদিকে সরকারি কর্মচারিদের যোগসাজসে ঘুষ, কর ফাঁকি ধরনের নানা সমস্যায় অর্থনীতি বিপর্যস্ত হতে থাকল। এই ফাঁকি দেবার ব্যপারটা বোধ হয় দেশভাগের সময় থেকেই পূর্ব সীমান্তে বেশ জমে উঠছিল। পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত ঘর থেকে কলকাতায় জীবিকা অর্জনের জন্য বাস করবার প্রবণতা বিশ শতক থেকে খুব বেড়ে গিয়েছিল। বিদেশি সদাগরি অফিস, কারখানা, সরকারি দপ্তর কলকাতায় বিশ শতকে দ্রুত বেড়েছে। পূর্ববঙ্গর মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির কলকাতায় বাসাবাড়িতে বাস করা আর নানা পারিবারিক টানে বিশেষ করে পুজোর সময় দেশের বাড়িতে যাবার একটা রেওয়াজ ছিল। দেশভাগ হবার পরও কয়েক বছর এই ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু দেশভাগ হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শিয়ালদা স্টেশনে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও উৎপাদন শুল্কের উর্দিধারীদের দিয়ে যাত্রীদের জিনিসপত্র তল্লাসীর উৎপাত শুরু হয়ে গেল। নারায়ণ কাকা তখন উৎপাদন শুল্কের ইন্‌স্পেক্টর পদে

শিয়ালদা স্টেশনে নিযুক্ত। যদিও নারায়ণ কাকারা বরিশালের পিরোজপুর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েই দেশভাগের পরে কলকাতায় এসেছিলেন, দুই বাংলার মধ্যে যাতায়াতকারীদের তল্লাসি করে নতুন কাপড়-চোপড় বাজেয়াপ্ত করার কাজে কোনরকম দয়া-ধর্মে তিনি দুর্বল হয়ে পড়তেন না। ছোটকাকার শ্বশুরবাড়ি ছিল বগুড়ায়। বগুড়াগামী গাড়িতে পুজোর সময় তল্লাসি করে ছোটকাকার শ্বশুরবাড়ির মানুষদের নতুন কাপড়-চোপড় কেড়ে নিয়ে নারায়ণ কাকা যখন চলে যাচ্ছেন, ছোটকাকার শ্যালক শম্ভুমামা হঠাৎ চিনতে পেরে, পরিচয় দিয়ে কাপড়গুলি ফেরৎ পেলেন। শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা এই সব বাজেয়াপ্ত করা নতুন কাপড় থেকে কিছু যে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যেতেন না এমন নয়। বাস্তুহারা পরিবারের মানুষদেরও সব ক্ষেত্রে সমবঞ্চিত অন্যদের প্রতি বিশেষভাবে দয়াপরবশ হবার কথা শোনা যায়নি।

এদিক থেকে তুলনাহীন ছিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। কাঠ বাঙাল, বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, গান্ধীভক্ত, কুমিল্লার অভয় আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যদিও এমন কিছু একটা জননেতা ছিলেন না, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অবিভক্ত বাংলা থেকে একমাত্র সদস্য ছিলেন। দেশভাগের সময় ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী করা হল। তার অল্প কয়েক মাস আগে, ১৯৪৬-এর অক্টোবরে নোয়াখালির গণহত্যা আর ব্যাপক হারে নারী নির্যাতন ঘটে গেছে। নভেম্বর থেকে চার মাস গান্ধীজী নোয়াখালির বিপর্যস্ত অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে ঘুরে হিন্দুদের মনোবল ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গান্ধীজী নোয়াখালি থেকে ফিরে আসার দুমাস পরে ঐ অঞ্চলের ইংরাজ বিভাগীয় কমিশনার কলকাতার দপ্তরে দীর্ঘ রিপোর্ট দিয়ে হিন্দুদের আতঙ্কিত অবস্থার কথা জানালেন। এই রকম অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পূর্ব পাকিস্তান পর্যটন করে হিন্দুদের বাস্তু ত্যাগ না করার পরামর্শ দিয়ে এলেন। আর এই ধরনের পরামর্শ তিনি জহরলালকে জানালেন। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন নেই এটা জহরলাল প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতাদেরও মনের কথা। এটা গান্ধীজীরও সত্যাগ্রহ ভাবনার অনুকূল। আর সব থেকে বিচিত্র ব্যপার হল কাঠ বাঙাল প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কাছে তাঁর অতি পরিচিত বাস্তব, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকেও বিশ্বাসের কথা বা আদর্শের কথা বড় হল। এটা একেবারে বাঙালি পণ্ডিতদের ধরনের সঙ্গে মিলে যায়। জাতীয় আয়ের পরিমাপ, বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সমস্যা দেখার চেয়েও লন্ডন স্কুল অব ইকন্‌মিক্সের অধ্যক্ষ লায়নেল রবিন্সের মূল্যবোধ নিরপেক্ষ বিজ্ঞান বলে অর্থনীতিক অধ্যয়নের শিক্ষা বাঙালি পণ্ডিত অতি আনন্দে বুকে তুলে নেবে।

বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগের পরিণতি একেবারে আলাদা রকমের হল। পাঞ্জাবের সমস্ত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য পৃথিবী বিখ্যাত স্থপতি ও নগরপরিকল্পনাবিদ লা কর্বুশিয়রকে এনে চন্ডীগড় নামে দেশের মধ্যে সব থেকে আধুনিক পরিকাঠামো সম্পন্ন একটা নগর গড়া হল। দিল্লি শহরের ১৯৪৭ সালের পরিধি এক দশকের মধ্যে অন্তত তিন গুণ বাড়ানো হল। বাংলায় কারও কোনো পুনর্বাসন দরকার হবে না দিল্লীর নেতৃত্ব, গান্ধীজী ও গান্ধীজীর বাঙালি চেলারা ধরে নিলেন। সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা দেখার জন্য দুই রাষ্ট্রের দুই প্রধানমন্ত্রী— জহরলাল নেহেরু ও লিয়াকৎ আলি খান চুক্তি করলেন। চুক্তি অনুযায়ী দুই

দেশের সংখ্যালঘুরা নিজেদের ভিটেতে ফিরে যাবে। আর সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে দুই দেশের সরকার। এর ফলে মুসলমান উদ্বাস্তুরা অনেকেই তাদের ভিটেতে এসে স্থিত হল কিন্তু হিন্দু উদ্বাস্তুরা বাস্তুচ্যুত হতেই থাকল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নানাভাবে বাংলার হিন্দু বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসনের দায় এড়িয়ে গেল। ফলে প্রাণের ভয়ে ভিটেমাটি ছেড়ে আসা হিন্দু উদ্বাস্তু সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে নিজেদের থাকার জায়গা করে নিতে লাগল। পূর্ব বাংলা থেকে বিতাড়িত হিন্দু উদ্বাস্তুদের বাসের জন্য পশ্চিম বাংলাতে গড়ে ওঠা কলোনীগুলোর মাত্র ২০ শতাংশ অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশ সরকারি উদ্যোগে তৈরি হয়েছিল। ফলে কোথায় চন্ডীগড়, নতুন গড়ে ওঠা দিল্লির পরিকাঠামো! সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত দায়সারা পরিকাঠামোয় কলকাতার চতুর্দিকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল মুখ থুবড়ে পড়ল। সেই চরম বিপর্যয়ের সময় স্বাধীন দেশের অর্থনীতি খুব একটা সচ্ছল হবার কথা নয়। লা কর্বুশিয়রের কাজের জন্য ও চন্ডীগড় ও দিল্লীর আধুনিক পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য কত খরচ হয়েছিল? সারা দেশের সরকারি মূলধনী খাতে ব্যয়ের সেটা কত অংশ? এ সব খবর কে রাখে?

বাংলা ভাগের সময় কলকাতার নতুন প্রশাসনের শীর্ষে গান্ধীজীর প্রাণের মানুষরা বসে আছেন— মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, রাজ্যপাল রাজাগোপালাচারি যাঁকে গান্ধীজী তাঁর জাগ্রত বিবেক বলতেন। আর গান্ধীজী ঠিক সেই সময় কলকাতার বেলেঘাটায় সুরাবর্দীর ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁকে নিয়ে বাস করছেন। মজা হল হিংসার চূড়ান্ত করেও শুধু গান্ধীজীর পা ছুঁয়ে পাপীরা পার পেয়ে যেত। যেমন সুরাবর্দী, যেমন নোয়াখালির পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট আবদুল্লা। কিন্তু গান্ধীজীর মতাদর্শ মেনে না নিলে কংগ্রেস থেকে চিরনির্বাসনের ব্যবস্থা হত— যেমন শ্যামাপ্রসাদ যেমন সুভাষচন্দ্র। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে এই দুজনই ছিলেন প্রকৃতপক্ষে বাংলার নেতা। আর একজন জননেতা ছিলেন ফজলুল হক। চিত্তরঞ্জনের জীবিতকালেই ফজলুল হক জমিতে রায়তের অধিকার, মহাজনের হাত থেকে চাষীর স্বার্থরক্ষা আর সরকারি দায়িত্বে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। বাংলার অন্য দুজন মুসলমান রাজনৈতিক নেতা নাজিমুদ্দীন ও সুরাবর্দী ছিলেন জমিদারবংশীয় ও উর্দুভাষী পরিবারজাত। ফজলুল হক ছিলেন নিম্নবিত্ত বাঙালি পরিবারজাত খুব ভাল ছাত্র। দাবিগুলির কথা ভাবলে ফজলুল হককে গান্ধীজীর সহগামী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ফজলুল হক তো গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, রামধুন, গীতা কখনো গ্রহণ করেননি। কাজেই ফজলুল হকের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সরকারে কংগ্রেসের যোগ দেবার জন্য সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ গান্ধীজী প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু হিংস্রতার চূড়ান্ত ঘটিয়েও সুরাবর্দী গান্ধীজীর সহানুভূতি পেতে পারেন। হয়তো কংগ্রেস ফজলুল হকের সঙ্গে সরকারে যোগ দিলে পরবর্তী ঘটনাবলী ও কলকাতার দাঙ্গা হত না। কলকাতার দাঙ্গা না হলে হয়তো বিহারের দাঙ্গা হত না। হয়তো পূর্ব ভারত অত বড় ধ্বংস যজ্ঞ থেকে অব্যাহতি পেত। ফজলুল হক সরকারে যোগ না দেবার পরামর্শ গান্ধীজীকে দিলেন বিড়লা, নলিনীরঞ্জন সরকার ও মৌলানা আজাদ। বিড়লা নিশ্চয়ই একটা অর্থনৈতিক ভাবনা থেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। ফজলুল হকও তো প্রধানত অর্থনৈতিক দাবি রেখেছিলেন। গান্ধীজী

কি এর মধ্যে কোনো একটি অর্থনৈতিক দাবি বা ভাবনার পক্ষপাতী ছিলেন?

সব মিলে দেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চূড়ান্ত অবিবেচনায় কলকাতা ও পশ্চিম বাংলার বাস্তব পরিকাঠামো, কাজের সাংগঠনিক পরিবেশ সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হল। সমস্ত দেশের বেলাতে যেটা সত্য পশ্চিম বাংলা ও কলকাতার বেলাতে সেটা আরও বেশি সত্য যে বিনিয়োগের হার বাড়িয়েও দেশের বা রাজ্যের আশানুরূপ আয় বা উৎপাদন বৃদ্ধি হল না। পরিকাঠামোর অভাবে, শৃঙ্খলার অভাবে বিনিয়োগের উৎপাদন ক্ষমতা ব্যাহত হল। দিল্লিতে আধুনিকতম পরিকাঠামো দিয়ে স্বাধীনতার অব্যবহিত পারেই শহরের আয়তন চতুর্গুণ করা হল, দেশের আধুনিকতম শহর চন্ডীগড় নির্মিত হল, কলকাতা উপেক্ষায়, সমস্যায় শুধু ক্লিষ্ট হতে থাকল। সম্প্রতি একটা নিবেদিতা সেতু নির্মাণ করেই হুগলির একটা অঞ্চলকে কতটা বিনিয়োগের উপযোগী করা যায় এটা তো আমরা দেখলাম।

দেশভাগের সময় পূর্ব বাংলা থেকে আসা মানুষেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেদের পুনর্বাসন করে নিচ্ছিলেন। কলকাতায় বাঙালের সংখ্যা বাড়তে লাগল। বাঙাল ঘটির একটা সাবেকী রেষারেষি ছিল। সেটা কতটা সামাজিক কতটা সাংস্কৃতিক বলা যায় না। তবে বাংলা ভাষার আঞ্চলিক বিভিন্নতা নিয়েই শ্লেষ-কৌতুক চলত। আর সর্বোপরি রেষারেষির হার-জিৎ নিষ্পন্ন হতো ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফুটবল খেলার ফলাফলে। কখনো কখনো বাঙাল স্কুল পড়ুয়াকে সহপাঠির ছড়ার লক্ষ্য হতে হত— "বাঙাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু। লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে ল্যাজ নেই কিন্তু"। বকুর ঠাকুমা বলতেন— "গড়পারের ছেলেরা তো ভালই ছেলো, বঙ্গদেশের ছেলেরা এসে খারাপ করে দিলে"। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল ঘটি মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এসে বাঙালদের পুনর্বাসনের স্বার্থে দিল্লীর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। কাঠবাঙাল প্রথম মুখ্যমন্ত্রী গান্ধী ভক্তির জেরে বাঙালদের পুনর্বাসনের ব্যাপারটা পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছিলেন। যে দুজন আইসিএস-এর লেখাতে বাংলার দেশভাগের সমস্যা ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার কথা জানা যায়— হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও অশোক মিত্র— এঁরা দুজনই ঘটি। তখন বাঙাল আইসিএস-এর অভাব ছিল না। দেশভাগ নিয়ে তাঁদের কারও কোনো লেখা নেই। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙাল। তাঁরা কেউ দেশভাগ নিয়ে মনে গভীর কোনো দাগ রাখবার মত কিছু লিখে যাননি। দেশভাগ যে সাম্প্রদায়িকতার ফল একথা থেকে মুখ লুকিয়ে রাখার ঝোঁক একটা বড় ব্যাধির মত এঁদের পেয়ে বসেছিল। সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে স্বীকার করা আর সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি করে পরস্পরের ক্ষতি করা যে একেবারেই এক কথা নয় এটা কে বোঝাবে?

খানিকটা পুনর্বাসনের কথা ভেবে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় কল্যাণী শহরের পত্তন করলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন বিমানবাহিনী যুদ্ধের জন্য ওখানে খানিকটা পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। সেই পরিকাঠামোর উপরে ভরসা করে যে শহর হল শিল্প উদ্যোগের জন্য যথেষ্ট নয়। আজও কলকাতা থেকে কল্যাণী যাতায়াতের জন্য কোনো আধুনিক শিল্পের প্রয়োজন-উপযোগী রাস্তা নেই।

কলকাতার অধিকাংশ রাস্তায় স্তূপীকৃত আবর্জনা। ফুটপাত যেখানে যেটুকু আছে তার অনেকটাই দোকানের-ব্যবসার উপচে পড়া উপকরণে আটকে রাখা। বাস, অটো রিক্সা যেখানে খুশি রাস্তা আটকে, পথিকের রাস্তা পারাপারের নির্দিষ্ট জায়গা আটকে দাঁড়াতে পারে। রেল স্টেশনগুলিতে ট্রেন থেকে নেমে এসে শহরের জন্য গাড়ি ধরার জায়গা অপরিকল্পিত আর অগোছালো। এইসব মিলে মানুষ আর মালপত্র যাতায়াতের গতি কমিয়ে দেয়। একটা কাজ থেকে আর একটা কাজে যাবার বা জিনিস পাঠাবার জন্য সময় ও অর্থ দুটোর ব্যয়ই বেড়ে যায়। যত বেশি অব্যবস্থাজনিত বাধা তত বেশি ব্যবস্থাপনার জন্য নিয়োজিত সরকারি কর্মীর বিধি-বহির্ভূত আয়ের সুযোগ। এটা সমস্ত দেশের সব সরকারি বিভাগের একটা সাধারণ ব্যাধি। বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ অনগ্রসর দেশে বেশি। রাষ্ট্র যত অনগ্রসর, রাজস্ব বিভাগ তত আনাড়ি, বকেয়া রাজস্ব তত বেশি। অবশ্য শুধু আনাড়ি বল্‌লে প্রশাসনের ব্যাধির কারণটা পুরো ধরা পড়বে না। প্রশাসনে নিযুক্ত কর্মচারী পদ্ধতিকে যত শ্লথ করবে উপভোক্তার অস্থিরতা তত বাড়বে আর কর্মচারীটির ঘুষ পাবার সম্ভাবনা তত বাড়বে। মজার ব্যপার হল এই সাধারণ ব্যাধি ও সাধারণ ব্যভিচার বোঝাটা প্রশাসনের কর্তাদের কাছে অতি সরল ব্যাপার হলেও ব্যাধি নিরাময় ও ব্যভিচার বন্ধ করবার চেষ্টা কর্তারা করবেন না। কর্মচারীকে রক্ষা করবার জন্য শ্রমিক সঙ্ঘ আছে আর কর্তাদের নমনীয়তায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নির্বাচন ব্যয় মেটানোর ভাবনাটাও আছে। কলকাতার নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা আর পরিচ্ছন্নতা আনবার প্রধান দায়িত্ব কলকাতা কর্পোরেশনের। রাজস্ব হল দায় দায়িত্ব বহনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় উপায়। কে আর সাধ করে ট্যাক্স দিতে চায়? ট্যাক্স আদায়ের ভারপ্রাপ্ত রাজস্ব বিভাগের কর্মীর হাতে ট্যাক্স বা করের পরিমাণ নির্ধারণের ভার। কলকাতার কোনো এক পাড়াতে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন। বিভিন্ন বাড়ির বিভিন্ন পরিমাণ করের মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারেন কি না। রাজস্ব বিভাগ থেকে যে কোনো সময় পনেরো-কুড়ি-পঁচিশ বছর আগের প্রদত্ত করের রসিদ চাইতে পারে। যদি কোনো রসিদ দেখাতে না পারেন তাহলেই— "হল না হল না ফেল" বলে আপনার মাথায় স্লেটের বাড়ি মেরে আবার কর আদায় করবে। আর যদি রসিদ দেখাতে পারেন তা হলে রক্ষা পাবেন। কথা হল কর্পোরেশনের এই ধরনের বকেয়া করের দাবির আশি শতাংশ ক্ষেত্রে করদাতা রশিদ দেখিয়ে অব্যাহতি পান। তাহলে কর্পোরেশন এখানে বকেয়া কর দাবি করল কেন? কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগ কি ঠিক মত রেকর্ড রাখে না? মিউটেশনের পরেও পূর্ববর্তী সব বছরের কর বকেয়া বলে দাবি করা হয়। তাহলে কি কর না মিটিয়েই মালিকের নাম নথিভুক্ত করা হয়? কোনো কর্মচারীর এজন্য জবাবদিহি করতে হয় না। আপনি উকিলবাবুর কাছে যান। করদাতার কাছে করের রসিদ থাকা সত্ত্বেও বকেয়া কর কেন দাবি করা হল, কর্পোরেশনের রাজস্বর রেকর্ড কোথায় গেল— এই সব প্রশ্নের মধ্যে উকিলবাবুও যাবেন না। মামলার ব্যয় যে আপনার কাছে নিতান্তই লোকসান এই রকম পরামর্শ দেবেন। মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি, দপ্তরের কাজে গাফিলতির জন্য দায়ী ব্যক্তির সনাক্তকরণ ও শাস্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল।

প্রশাসনে দুর্বলতা আর বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রতা অনগ্রসর অর্থনীতির চরিত্রের মধ্যে নিহিত আছে। আধুনিক জীবনযাত্রায় পেশা আর ভোগ্যপণ্যর চিহ্নে মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হচ্ছে। সমাজের ঐতিহ্যগত বন্ধন আলগা হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় প্রশাসন আর বিচার ব্যবস্থার তৎপরতার উপরে নির্ভরতা বেড়ে যাবার কথা। গণতন্ত্র, কল্যাণমূলক রাষ্ট্র, সমাজতন্ত্র যাই বলুন না কেন ব্যক্তি স্বাধীনতার জন্য, দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির জন্য তৎপর প্রশাসন আর বিচার ব্যবস্থা একটা জরুরি শর্ত। আমেরিকাতে রজত গুপ্তর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কর্পোরেট ব্যক্তিত্বর মামলা দু-বছরের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে শাস্তি হয়ে গেল আর কোয়াত্রোচির মত অতি সাধারণ স্তরের আন্তর্জাতিক অস্ত্র সরবরাহের দালাল এদেশের সরকারকে কলা দেখিয়ে পালিয়ে গেল। স্বাধীনতার ঠিক পরেই ১৯৪৮ সালে দেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য কোনো নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে জীপ কেনার অভিযোগ কৃষ্ণ মেননের বিরুদ্ধে উঠেছিল। কিন্তু কৃষ্ণ মেননের বামপন্থী ভাবমূর্তির জন্য জহরলাল তাঁকে মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করে পুরস্কৃত করলেন। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে দেশের সমস্ত শক্তি একত্রিত করবার জন্য দেশের মানুষদের ভিতরে সাম্প্রদায়িক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অনেক প্রশ্ন গান্ধীজী এড়িয়ে গিয়েছিলেন। আর স্বাধীনতা অর্জনের পরে রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধাঁচে দেশের শিল্পায়নের লক্ষ্যে জহরলাল গণতন্ত্রের অনেক শর্ত এড়িয়ে গিয়েছিলেন। সব কিছু মিলিয়ে সাধারণ মানুষের কল্যাণের প্রশ্ন অনেকটা অবহেলিত হল। সাবেক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের কল্যাণ তাঁর সামাজিক আনুগত্য থেকে আসত। সমাজ ব্যবস্থায় এক ধরনের ধর্মবোধ থেকে শৃঙ্খলা আসত। বাজারভিত্তিক অর্থনীতিতে প্রশাসন আর বিচার ব্যবস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতায় এক ধরনের নিয়ম শৃঙ্খলার অভ্যাস তৈরি হয়। এই দুটির কোনোটি না থাকলে রাজনীতির নামে অরাজকতার অবস্থা দেখা দেবে।

দেশে একের পরে এক বড় বড় নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজ, প্রতারণা, তঞ্চকতা ঘটে চলেছে। কখনো কখনো প্রতারকের শাস্তি হচ্ছে। আবার কখনো কখনো রাজনৈতিক ডামাডোলে প্রতারকের কোনো বিচার হচ্ছে না। হরিদাস মুন্দ্রার 'জীবন বীমা নিগমে'র কাছে বেশি দামে শেয়ার বিক্রি করা, প্রতিরক্ষা বিভাগে কামান কেনা, হর্ষদ মেহ্তার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছে বেশি দামে শেয়ার বিক্রি করা, পশুখাদ্য কেলেঙ্কারী থেকে হাল আমলের হেলিকপ্টার কেনা, কয়লা খনির ইজারা, তথ্যপ্রযুক্তির সুযোগ বিক্রি— এই রকম অনেক ক্ষেত্রে সরকারের ক্ষতি করে ব্যক্তিস্বার্থ পরিপোষণ করার অভিযোগ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযোগের কোনো আইনি নিষ্পত্তি হয়নি। এছাড়া কতগুলি ঘটনায় বাজারকে বিপর্যস্ত করে সাধারণ মানুষের বড় রকমের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। যেমন ১৯৮২-র কেন্দ্রীয় বাজেটে আংশিকভাবে সিমেন্টের রেশনিং তুলে দিয়ে খোলা বাজারে যোগানের নিয়ম করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক বছর সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সিমেন্ট দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল। সিমেন্টের দাম ৩০ টাকা থেকে বেড়ে প্রতি ব্যাগ ৫০ টাকা থেকে ১২০ টাকায় কালোবাজারি হতে থাকল। এর জন্য তদানীন্তন নেহেরু-গান্ধী পরিবারের অতি বিশ্বস্ত অর্থমন্ত্রীকে কোথাও

কোনো জবাবদিহি করতে হয়নি। এইরকমই ২০০১ সালে ইউনিট ট্রাস্টের টাকা সন্দেহজনক ও দুর্বল শেয়ারে বিনিয়োগের ফলে অনেক আমানতকারি সর্বস্বান্ত হল। তখন রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকের রাজার মত আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী যেন বললেন— ঠাঁই বদল করে নাও। দোষ কেটে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হলেন অর্থমন্ত্রী আর অর্থমন্ত্রী নিলেন প্রতিরক্ষার দায়িত্ব। অর্থ আর প্রতিরক্ষার কেনাকাটার আশ্চর্য দ্যোতনা। ভাবুন জীপ, বোফোর্স কামান, ওয়েস্টারগার্ড হেলিকপ্টার— বিদেশ থেকে বড় বড় কেনাকাটা থেকে শুরু করে নানা প্রকারের কর ফাঁকি হয়ে লাইসেন্স, পরিদর্শন বা ইন্‌স্পেকশন্ পর্যন্ত রাজস্ব ফাঁকি দেবার কি ব্যাপক অভ্যাস। ফলে রাজস্বের অভাব। কল্যাণ আর পরিকাঠামোর টাকার টানাটানি।

তখন সবার মনে পড়ল বাজার-অর্থনীতির কথা। লাইসেন্স-ইন্‌স্পেকশনের বাড়াবাড়ি কমালে বাজারে প্রতিযোগিতার প্রবল ঢেউ উঠবে বলে ভাবা হল। কিন্তু কয়লা খনির ইজারা দেবার ব্যাপারে, তথ্যপ্রযুক্তির স্বত্ব বিতরণে নীলামকে শিকায় তুলে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার গোপনীয়তা জলাঞ্জলি দিয়ে, দেশের সরকারি হিসাব নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণকে দুর্বল করে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা পঙ্গু করার খেলা চলে। এই অর্থনৈতিক পঙ্গুত্বর খেলায় বড় ব্যবসায়ী আর বড় রাজনৈতিক নেতার ক্ষমতা ফুলে ফেঁপে উঠতে পারে। বিড়লাদের সঙ্গে গান্ধীজীর সখ্য থেকে ব্যবসা আর রাজনীতির জোটের যে ধারা শুরু হয়েছিল আজ সেই সখ্য বহুবিধ লক্ষ্যে বহু ধারায় রূপ থেকে রূপান্তরে বিকশিত হচ্ছে। প্রতিযোগিতার কথা যদি কোথাও এখনো থেকে থাকে তবে সেটা অর্থনীতির ক্লাশঘরে। ক্লাশঘরে অর্থনীতির মাস্টারমশাই আধাখেঁচড়া অঙ্কের দখল নিয়ে লড়ে চলেছেন। রাশিয়ান গণিতজ্ঞের উপপাদ্য দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ভারসাম্যর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে। মনে পড়ছে আমার লিয়াপুনভের লেমার অনেক তরলীকৃত ভাষ্য নিয়ে ক্লাসের মধ্যে বিপর্যস্ত লড়াই-এর মাঝখানে হঠাৎ পার্থ নামে একটি বেপরোয়া ছাত্র একটা গোড়া ঘেঁষে প্রশ্ন করে বসেছিল— "এসব করে কি হবে স্যার?" পার্থ এখন কোনো ভাল কলেজে পড়াচ্ছে, এবং হয়তো আমার মতই, জানালার বাইরে রোদ না বৃষ্টি তার তোয়াক্কা না করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের ভারসাম্যর তত্ত্ব নিয়ে গণিতের ভাঙাচোরা তরলীকৃত উপপাদ্য নিয়ে লড়ে যাচ্ছে।

মানুষ বিশ্বাস নিয়েই তো বেঁচে থাকে। বিশ্বাসী লোকেরা বলবেন বাজার তো একটা খেলা। কিছুটা মিথ্যাচার কিছুটা ভয় দেখানো এ সবই বুদ্ধির খেলার অঙ্গ। তার থেকেই গরীব ভোটদাতার কপালে বিত্তর তলানি চুঁইয়ে ভোগ করবার মত যা হোক কিছু একটা পড়ে। অন্য কোটিতে অর্থনীতি আর রাজনীতির জোট বেঁধে লড়াইটা শুরু করেছিলেন ফজলুল হক। ঐ ধরনের লড়াইকে কোনো একটা বদনাম দিয়ে বানচাল করার চেষ্টা হবেই। কমিউনিস্টদের অর্থনীতির কাঠামোতে রাজনীতি চিনবার সাবেক ভাষ্যর কথা সবাই জানে। জহরলাল থেকে শুরু করে ভক্ত কমিউনিস্টরা দেশ স্বাধীন হবার পরে রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজির স্বপ্ন দেখেছিলেন। কমিউনিস্টরা আজাদীকে 'ঝুটা' বলা থেকে শুরু করে কুড়ি বছর পরে

রাজনৈতিক শক্তির উৎস বলে বন্দুকের নলকে চিনতে পারল। আবার কমিউনিস্টদের বড় বড় সভা সমিতি কলকাতায় আর বাংলার মফঃস্বলেই চলতে থাকল। তার উপর দিয়ে বাংলায় দেশভাগের মার চলেছে। বাঙাল মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙাল উদ্বাস্তুকে প্রতিহত করবার জন্য "শিয়ালদা স্টেশনে পাচিল তুলে দিব" বলে ধমকে উঠলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খান আর জহরলাল মিলে সংখ্যালঘুর নিরাপত্তার চুক্তি করলেন। ফলে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুর সম্পত্তি রক্ষা পেল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অমুসলমান সংখ্যালঘুর বিতারণ অব্যাহত থাকল। পশ্চিমবাংলাতে উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনের দাবি দিল্লির কংগ্রেস সরকার কখনো মেনে নিল না। কমিউনিস্টরা মিটিং মিছিল বিক্ষোভের জন্য হতভাগ্য উদ্বাস্তুদের পেল। তার মোট পরিণাম হল কলকাতায় অপরিকল্পিত বসতির বিস্তার আর অনিয়ন্ত্রিত নাগরিক ব্যবস্থা। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের প্রয়োজনে দিল্লীর পরিকল্পিত প্রসার ঘটেছিল, চন্ডীগড় শহরের সৃষ্টি হয়েছিল। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কলকাতার জন্য অনুরূপ পরিকল্পনার দাবি কমিউনিস্টরা কখনো করেছে বলে কেউ শোনেনি। হাল আমলেও বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার শাস্তি পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের পেতে হল। কমিউনিস্টরাও সেখানে কিভাবে রোজা-নামাজের আড়ালে মুখ লুকোলেন দেখে তসলিমা নাসরিন লজ্জা পেয়েছিলেন। প্রগতিশীল বাঙালিরা এরপরে যদি তসলিমা নাসরিনের মুখ দর্শন না করতে চান তাহলে কি কিছু বলার থাকতে পারে?

স্বাধীনতার পরেও বেশ কিছুকাল বাংলা ও কলকাতার সম্মান বড় করে দেখা হয়েছে। দেশের প্রথম আইআইটি হল খড়গপুরে— বাংলায়। দেশের প্রথম আইআইএম হল কলকাতায়। প্রধানত যৌথ মালিকানা ব্যবসা তাছাড়া সব রকম বড় মাপের প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা শেখানোর জায়গা হল আইআইএম। অল্প কিছুকালের মধ্যে কলকাতার আইআইএম অতিবাম মার্কসবাদ চর্চার জায়গা কি করে হল কে জানে। বাংলায় চাষী-ভাগচাষী-ক্ষেতমজুর মার্কসের তত্ত্বের কোন ভগ্নাংশের মধ্যে পড়ে এটা বোঝা জরুরি ব্যাপার হয়ে গেল। নৈয়ায়িক ঐতিহ্যর বাঙালি যখন মার্কস না মার্শাল না কেইনস নিয়ে গভীরভাবে ভাবিত তখন মহারাষ্ট্রের ডান্ডেকর ওড়িষার নীলকণ্ঠ রথকে সঙ্গে নিয়ে সোজাসুজি তথ্য যাচাই করে দেখালেন যে দেশের অন্তত চল্লিশ শতাংশ মানুষের খাওয়া জোটে না। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সূত্রপাত করা নমুনা সমীক্ষার তথ্য সরকারের দপ্তরে জমছিল। প্রশান্তচন্দ্রের উনিশ শতকী বাঙালির মেজাজ থেকে বাঙালি পণ্ডিত তখন অনেক দূরে সরে গেছে। দেশে বিশাল দারিদ্র্য আর খাওয়া-পরার শোচনীয় বৈষম্যর খবর প্রথমে দৃষ্টগোচর করার কৃতিত্ব ডান্ডেকর ও রথের। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা নিয়মিত দেশের মানুষের খাওয়া-পরার তথ্য সংগ্রহ করে মাথাপিছু ব্যয়ের বর্গ অনুযায়ী পারিবারিক পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। একই সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের জীবিকা আর বেকারত্ব নিয়ে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে তিনটে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পার হয়ে গেছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাঁচ বছরের মধ্যে খাদ্যশস্যর সংকট ও মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছিল। বৈদেশিক মুদ্রার অভাব আর বহির্বাণিজ্যে ঘাটতি শুরু হয়ে গেছে। তার উপরে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনার সময়ের মধ্যে চীন আর পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে যাওয়াতে বিনিয়োগযোগ্য বিত্তের টানাটানি পড়ে গেল। আমেরিকা থেকে গম সুবিধায় পাওয়াতে খাদ্য ঘাটতি খানিকটা সামলানো গেল। কৃষিতে ফলন বাড়ানোর জন্য বেশি ফলনের বীজ আর সেই সঙ্গে সার, কীটনাশক আর নানা উপায়ে সেচের জন্য জল আহরণের উদ্যোগ শুরু হল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সময় মত শুরু করা গেল না। তিন বছর বার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে বিনিয়োগ করা চলতে থাকল। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিনিয়োগের দিকে সঞ্চয়কে পরিচালিত করবার জন্য জীবন বীমা জাতীয়করণ হল। আর ঠিক তার পরেই হরিদাস মুন্দ্রা নামে এক ব্যবসায়ীর ফাঁপা, কম মূল্যের শেয়ার বেশি দামে কিনে জীবন বীমার বড় রকমের ক্ষতি ঘটানো হল। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল তখন দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করলেন। হরিদাস মুন্দ্রা শাস্তি পেলেন। কিন্তু বিত্তমন্ত্রী টি টি কৃষ্ণমাচারী কেবলমাত্র পদত্যাগ করেই অব্যাহতি পেলেন। এমন কি দায়িত্বহীনতার জন্য ও রাষ্ট্রের বড় ক্ষতির জন্য কোনো দায় মন্ত্রীকে বহন করতে হয়নি। ইতিমধ্যে বণ্টনে বৈষম্য ও বেসরকারি মালিকানাতে একচেটিয়া পুঁজির উপরে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হল। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হল। বিদেশী মালিকানাভুক্ত ব্যবসার স্বদেশীকরণ করা হল। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের বিনিয়োগ ক্রমশ বাধ্যতামূলকভাবে বাড়ানো হল। কিন্তু এত করেও জাতীয় আয় বৃদ্ধির গড়পরতা হার ৩.৫০ শতাংশ।

ডান্ডেকার ও রথের দারিদ্র্যসীমার নিচের বিপুল জনসংখ্যার খবর উদ্ঘাটনের পরে দারিদ্র্যসীমার পরিমাপ নিয়ে অনেকে সমীক্ষা ও বিশ্লেষণ শুরু করল। বিভিন্ন গবেষকের পরিসংখ্যানগত ফলাফল একটিমাত্র নির্দিষ্ট কিছু না হলেও বিশালসংখ্যক মানুষ যে উৎপাদনের সুযোগ, খাওয়া-পরার সুযোগ থেকে বঞ্চিত আর অপুষ্টির শিকার এটা সন্দেহাতীতভাবে মেনে নিতে হল। আর দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অপুষ্টি থেকে উদ্ধারের জন্য উৎপাদনযোগ্য কাজের সুযোগ বাড়ানো যে একান্তভাবে জরুরি এটা ক্রমশ স্পষ্ট হল। দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করে, ৬০ শতাংশ মানুষকে নিজের উদ্যোগ থেকেই নিজের সংস্থান জোটাতে হয়, এই সব খবরও বড় হয়ে দেখা দিল। এসব দেখে কোনো বাঙালি তত্ত্বজ্ঞানী নয়, কোনো সাম্যবাদী নয়, একজন মহারাষ্ট্রের বেকারত্ব-শ্রমিক সংগঠন নিয়ে ওয়াকিবহাল অর্থনীতিবিদ ডি আর গ্যাডগিলকে পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হল। ডান্ডেকর, রথ ও গ্যাডগিল তিনজনই পুনার গোখলে ইন্‌স্টিটিউট অব পোলিটিক্স এন্ড ইকনমিক্সের লোক। গোখলে ইনস্টিটিউটে দেশের বাস্তব সমস্যা নিয়ে পরিসংখ্যানভিত্তিক কাজের ঐতিহ্য আছে। গ্যাডগিল কেম্ব্রিজ থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছিলেন। কর্ণাটকের ভি কে আর ভি রাও, মহারাষ্ট্রের ডি আর গ্যাডগিলের মধ্যে বাংলার বিদ্যাচর্চার উনিশ শতকী ধারার তুলনীয় লক্ষণ আছে। বিদেশে উচ্চ শিক্ষার পরে দেশের সমস্যাকে অধ্যয়ন ও অন্বেষণে এঁরা মন দিতেন। বিদেশে শেখা তত্ত্ব আর পদ্ধতির জালে সমর্পিত হয়ে বসে থাকতেন না।

এ দিকে দেশে নানা সমস্যা সত্ত্বেও মাথাপিছু জাতীয় আয় খানিকটা বেড়েছে। মানুষের